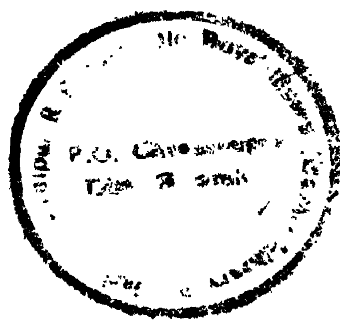
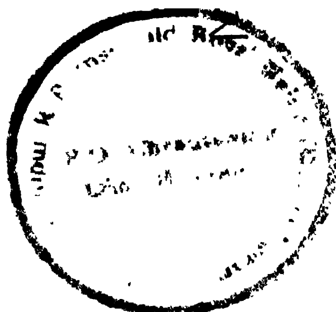
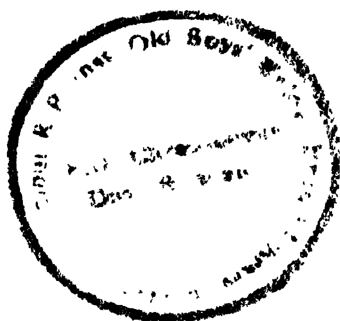




উপহার





নেপথ্য

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
"দেব-সাহিত্য-কুটীর"
২১।১ নং ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা

আশ্বিন—১৩৪১

—এক টাকা—

প্রিণ্টার—এস্, মজুমদার
"দেব প্রেস"
২৪ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

এক

এমনি করে'ই সব একদিন শেষ হ'য়ে গেলো।

এতো সহজে।

দু'দিনের সামান্য একটুখানি জ্বর, গায়ে ব্যথা আছে কি নেই, বিছানায় তেমন করে' গা ঢেলে পড়ে' থাকবার কথাও হয়তো মনে হয় নি—চপলার নাড়ী গেলো ছেড়ে, দেখতে-দেখতে তার দুই চোখ অজস্র শূন্যতায় সাদা, স্তব্ধ হ'য়ে এলো। ডাক্তার একটা ডাকবার যে ভীষণ দরকার সে-সম্বন্ধে সচেতন হ'বার পর্য্যন্ত সময় দিলো না। সামান্য একটা নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে নিশ্বাস গেলো ফুরিয়ে।

ব্যাপারটা সহ্য হয়তো বা করা যায়, কিন্তু কিছুতেই যেন বিশ্বাস করা যায় না।

নেপথ্য

শরীরময় তরল তনিমা অকস্মাৎ কতোগুলি মৃত মাংসস্তূপে আবিল হ'য়ে উঠলো, ছন্দ-উজ্জ্বল রেখা-চাপল্যের উপর নামলো সুবিস্তীর্ণ মেঘপুঞ্জ, শোণিতের সুরায় নেই আর সেই তাপ আর উচ্ছলতা, শরীরের মর্ম্মরিত বসন্ত-বিহ্বল অরণ্যে আজ বালুকাস্তীর্ণ বিশাল মরুভূমি—অনাদি তা কী করে' বিশ্বাস করে বলো ?

এতো আশা, এতো ভয়, অগণন স্বপ্ন ও সন্দেহ—সব গেলো মুহূর্ত্তে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে !

ঘরে-দুয়ারে চপলার কতো চিহ্ন এখনো উঁকি মারছে, হাওয়ায় এখনো তার সান্নিধ্যের তাপ, দেয়ালে মাথা কুটে মরছে এখনো তার হাসির হাহাকার। অথচ সে কোথাও নেই। আশ্চর্য্য, কোথাও নেই সে চারদিকে। আকস্মিকতাটা এতো প্রচণ্ড যে নিরাবরণ, নিরুচ্চার শোকের মধ্যেও অনাদি নিষ্ঠুর একটা কৌতুক অনুভব করছে।

একদিনের কথা তার এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে।

ফিরতে-ফিরতে সেদিন অনাদির অনেক রাত হ'য়ে গিয়েছিলো। তাসের টেবিল থেকে বন্ধুরা কেউ তাকে উঠতে দেয় না, ঘড়ির কাঁটা যতোই এগিয়ে চলে, বন্ধুরা ততোই অমানুষিক খেপে ওঠে : আরেক বাজি। এমনি করতে-করতে আকাশ-ভাঙা কী বৃষ্টিটাই না সেদিন নেমে এলো, অনাদির যাবার আর রাস্তা নেই। তবু সে একবার দু' হাতের মুঠিতে চেয়ারের হাতল দু'টো শক্ত-

করে' চেপে ধরে' প্রাণপণে বলেছিলো : আমি এবার উঠি।

—এই জলে? হেসে সবাই তাকে একেবারে উড়িয়ে দিলে : তুমি পাগল হয়েছ, অনাদি?

বোকার মতো মুখ করে' অনাদি বললে,—কিন্তু রাত কতো হয়েছে তার খেয়াল রাখো?

—কতো আবার! ন'টা এখনো বাজে নি।

হায়, ন'টা না বাজলে যেন রাত হ'তে নেই।

তবু এটা একটা ডাহা মফস্বল। যেখানে সামান্য একটা মিউনিসিপ্যালিটি পর্য্যন্ত নেই, যেখানে রাস্তায় নড়বড়ে খুঁটিতে কালি-পড়া কাচের ঘেরাটোপে নগণ্য একটা কুপি পর্য্যন্ত জ্বলে না। আলো জ্বালানোটা যেখানে বীভৎস একটা অপরাধের মতো মনে হয়, এমন জ্বলন্ত অন্ধকার। তারপর এই অনর্গল বৃষ্টি নেমে এসেছে। এতো অন্ধকার যে বৃষ্টিটাকে পর্য্যন্ত যেন ভালো করে' ধারণা করা যায় না।

অনাদি একরকম জোর করে'ই উঠে পড়লো : না ভাই, চলি, বউটা আবার ভাববে।

বন্ধুরা তাকে শত হস্তে বসিয়ে দিলে। বললে,—বোস, পাকামো করিস নে। তিন-চার বছর বিয়ে হ'য়ে গেলো, এখনো তুই বউর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বসে' থাকবি? নিজের ভাবনাটা বউর উপর চালান দিয়ে এখনো আমাদের চোখে তুই ধুলো দিতে চাস?

নেপথ্য

কাঁচু-মাচু মুখ করে' অনাদি বললে,—না ভাই, জানিস না, সত্যি-সত্যি আমার জন্যে ভাবছে। এতো রাত হ'য়ে গেলো, তবু ফিরছি না দেখে নিশ্চয়ই সে ঘর-বা'র করতে সুরু করে' দিয়েছে। ভারি ভীতু মেয়ে, লণ্ঠন নিয়ে চাকরকে হয়তো খুঁজতে পাঠিয়েছে চারদিকে, কান্নাই বা এতোক্ষণে জুড়ে দিয়েছে কিনা কে জানে!

তবু, চপলার কান্নার চেয়ে আকাশের কান্নাটাই এখন প্রবলতর। দুর্ব্বল, অসহায় ভঙ্গি করে' অনাদিকে ফের বসতে হ'লো।

বৃষ্টি তখনো ভালো করে' থামে নি, অনাদিকে আর ধরে' রাখা গেলো না, আগাছা-জঙ্গল ভেঙে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সে দ্রুত দীর্ঘশ্বাসের মতো বেরিয়ে গেলো।

সোজা একেবারে তার বাড়ির দরজায়।

কিন্তু, কাকস্য পরিবেদনা, টুঁ-শব্দটি কোথাও নেই।

চপলা দিব্যি খাওয়া-দাওয়া সেরে, রান্নাঘরের তোলা-পাট শেষ করে' সটান মশারি ফেলে শুয়ে পড়েছে। শুধু শোয়া নয়, স্থূলকায় রাশীভূত একটি ঘুম।

—কী আশ্চর্য্য, তুমি একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছ দেখছি। মশারির ভেতর দিয়ে ভিজে হাত বাড়িয়ে অনাদি তার খোঁপায় একটা টান মারলো: কই, এমন কথা তো কোথাও লেখা ছিলো না।

দু' চোখ থেকে ঘুম ঠেলে জড়িত গলায় চপলা বললে,—কী লেখা ছিলো না?

—যে, বিরহে একেবারে বিছানা পেতে ঘুমিয়ে পড়তে হয়।

—না, ঘুমোবে না! চপলা আরামে আরেকটু প্রসারিত হ'লো: কেমন সুন্দর আজ বৃষ্টি নেমেছে দেখেছ?

তারি জন্যে অনাদির জন্যে তার আর প্রতীক্ষা করবার দরকার নেই। অনাদি না আসুক, তার ঘুম তো এলো।

অনাদির গলায় তার মুখের মলিনতা টের পাওয়া গেলো: কেমন সুন্দর একা-একা খেয়েও নিয়েছ দেখছি।

—না, খাবে না! চপলা জলের মতো বললে,—আমার কি আর খিদে পায়?

—কিন্তু মুখে ভাত তোমার রুচলো, চপলা? অনাদির গলা একেবারে কাঠ।

—কেন রুচবে না? কেমন সেই মুড়ির ঘণ্টটা আজ রেঁধেছিলুম! জিভটা বাড়িয়ে চেখে দেখ না একবার—ঐ টোপের তলায়ই তো ঢাকা আছে।

—আগে থাকতে মুড়ির ঘণ্টটা খেয়ে নিয়ে বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছিলে। অনাদি একটা কাল্পিক খেয়ে মশারির বাইরে চলে' এলো: কেননা, যেমন ঘুটঘুট্টি অন্ধকার আর নাছোড়-বান্দা বৃষ্টি তায় আমি ফিরছি না—কখন কী খারাপ সংবাদ এসে পড়ে—সখ করে' রাঁধা মুড়ি-ঘণ্টটা খেয়ে নিয়ে ভালোই করেছ!

—তার মানে ? বালিসের ভিতর থেকে চপলা ফোঁস করে' উঠলো।

অনাদিকে কেমন ক্লান্ত, কেমন-বা একটু কাতর শোনালো : আমার জন্যে তুমি একটুও ভাবো না কেন, চপলা ?

—কেন, তোমার জন্যে কী আবার আমাকে ভাবতে হ'বে ?

—এতো রাত হ'য়ে গেলো, ঘড়িতে দশটা কখন বেজে গেছে, আমার এখনো ফেরবার নাম নেই, আমার জন্যে তোমার এক রতি ভাবনা হয় না ? একটুও ভয় করে না তোমার ?

—বা রে, চপলা বিস্ময়ে একেবারে সাদা হ'য়ে গেলো : বিকেল-বেলা বেড়াতে বেরিয়েছ, কোন কাজে কোথায় কখন আটকা পড়েছ না-জানি, মিছিমিছি ভাবতে যাবো কেন ? ভয় কিসের ?

—ভয় নেই ? অনাদি গম্ভীর মুখে বললে,—যদি আমি আজ না ফিরতুম ?

—কী মুস্কিল ! না ফিরবে তো যাবে কোথায় ?

—কে জানে কোথায় ! এতো রাতেও যখন ফিরছি না, রোজ যে-সময়ে আমাদের এক ঘুম হ'য়ে যায়, অনাদি বিবর্ণ গলায় বললে,—আমার কোনো একটা বিশ্রী বিপদ হয়েছে বলেও তো ভাবতে পারতে।

—বা রে, কী আবার তোমার বিশ্রী বিপদ হ'তে যাবে

এক ঝলক তারার আলোর মতো চপলা হেসে উঠলো: রাস্তায় একমাত্র পাল্‌কি ছাড়া যেখানে কোনো গাড়ি নেই! আর সে-পাল্‌কিও জোগাড় করতে হয় সাতদিন আগে খবর দিয়ে।

—কিন্তু আনাচে-কানাচে এখানে সাপ আছে জানো? জাত-সাপ! অনাদি বিষাক্ত মুখে বললে,—আর সেই সাপ এই বর্ষাকালেই বেশি বেরোয়? সেদিন উঠোনের উপর নিজের চোখে একটা দেখলে!

—সাপ আছে তো আমি কী করবো? সাপ বলে' জন্তু যখন একটা আছেই, তখন পৃথিবীর কোনো না কোনো জায়গায় যে থাক্‌বে তাতে আশ্চর্য্য হ'বার তো কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না।

—কিন্তু সেই সাপে আজ কাটা পড়তে পারতুম। আমাকে আর তুমি চোখেও দেখতে পেতে না।

—কোন দুঃখে?

—তুমি আমার জন্যে একটুও ভাবো না বলে'। অন্য স্ত্রী হ'লে—

মশারির ভিতর থেকে চপলা মুখ বাড়ালো।

—অন্য স্ত্রী হ'লে, তার স্বামী এখনো ফিরছে না দেখে, কক্‌খনো পুঁটুলি পাকিয়ে আরামে ঘুম মারতে পারতো না।

—অন্য স্ত্রী হ'লে আগে থাক্‌তেই বুঝি দড়ি পাকিয়ে তারস্বরে শোক করতে বসে' যেতো? চপলা চকিতে আবার মশারির মধ্যে ঢুকে গেলো; গম্ভীর, আচ্ছন্ন গলায় বললে,—যাও না, অন্য স্ত্রী

একটা ধরে' নিয়ে এসো না, কান্নার একেবারে একটা হরির-লুট বসিয়ে দেবে'খন। ভূতের মতো গুটি-গুটি বাড়ি ফিরে এসে দেখবে, তোমার সেই অন্য স্ত্রীটির আর বিধবা হ'তে কিছু বাকি নেই।

অনাদি জল হ'য়ে গেলো। তাড়াতাড়ি জামাটা ছেড়ে ফেলে দুই হাতে মশারিটা সে তুলে ফেললে। গুমোটের পর এক ঝলক উড়ন্ত বাতাসের মতো।

—তুমি আমাকে একটুও ভালোবাসো না, চপলা।

—কী করে' বুঝলে বলো তো? কোন্ বইয়ে আজ ওটা পড়ে' এলে জিগ্‌গেস করি?

—ভালোবাসলে কি আমার সম্বন্ধে তুমি এমন নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারতে?

—তুমি ভালোবাসার কী জানো? তোমাকে এতো ভালোবাসি যে সে একটা ভীষণ নিশ্চিন্ত ভালোবাসা। এমন ঘুমের মতো নিশ্চিন্ত।

—কিন্তু ঘুম থেকে জেগে উঠে যদি দেখতে, আমি তোমার পাশে নেই?

চপলা হঠাৎ স্বামীকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো: পাগল! আমাকে ছেড়ে তুমি যাবে কোথায়? আমাকে ছাড়া তোমার কোথাও জায়গা আছে নাকি পৃথিবীতে?

নেপথ্য

সেই চপলা!

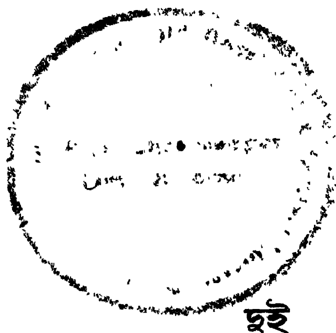
সমস্ত একটা অর্থহীন উপহাসের মতো লাগে না?

সংসার-রচনায় এতো যার সাধ-আহ্লাদ ছিলো, নিজে সাধ করে' সে আবার তা দু'পায়ে ঠেলে চলে' গেলো—এর মাঝে প্রকাণ্ড একটা মজা আছে বৈ কি। সংসারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কণিকতম জিনিসটিরো উপর তার কী অগাধ ছিলো মায়া! অনাদির অবস্থা তেমন কিছু নবনীতকোমল নয়, চপলার জন্যে বিলাসের উপকরণ সে বেশি সংগ্রহ করতে পারতো না, কিন্তু নখে করে' যেটুকু চপলা খুঁটে নিতে পারতো তাই তার কাছে অনেক। খেলো টিনের ফুল-তোলা একটি আয়না, দিশি একটা স্নোর বাটি, শুক্‌নো দু'পাতা আলতা—চপলা তাতেই একেবারে রাজ্যেশ্বরী। ফুরফুরে ঠোঁট দু'খানি পানের রসে যখন থেকে-থেকে টুকটুক করে' উঠতো, তখন তার কাছে কে লাগে! দেয়ালের কোণে-কোণে এখনো পানের পিক্ লেগে আছে, চিরুনির দাঁড়ায় আটকে আছে এখনো দু'গাছি শুকনো চুল। দেয়ালে-বেঁধা ছোট একটি আলমারি—তার উপর কতো রাজ্যের জিনিস যে সে জড়ো করেছে তার ইয়ত্তা নেই: কৌটো-শিশি, পেয়ালা-পিরিচ, এটা-ওটা-সেটা, যা তার যখন চোখে ধরেছে। আল্‌নাতে এখনো ভাঁজ করা আছে তার সেই লাল সাড়িটা—জ্বর হ'বার পর বিছানায় শোবার আগে যেটা সে শেষ ছেড়ে

রেখেছিলো। ঘর নিয়ে গোছগাছের তার অন্ত ছিলো না, দেয়ালে ফ্রেমে-আঁটা এখনো ঝুলছে তার তূলোর খরগোস, কাপড়-পরানো ক্যালেণ্ডারের মেয়েটা। নারকেলের দড়িতে বোনা তার নিজের হাতের পা-পোষটা এখনো দরজার কাছে। নিঃসলিল মরুভূমিতে কতো আর অনাদি বালুকণা খুঁড়বে? সব চপলা অনায়াসে ফেলে যেতে পারলো।

ফেলে যেতে পারলো তার কোলের এই প্রথম ছেলেকে, যার চোখের কাজলের দাগটা তার সস্নেহ ক'টি আঙুলের লীলায় এখনো জ্বলজ্বল করছে। ফেলে রেখে গেছে তার স্বামী—অনাদি তার কথা আর কী ভাববে?

এই তো সব কিছুর মূল্য!



দুই

এই তো সব কিছুর মূল্য। তার জন্যে কাব্য করতে কোনো উৎসাহ আসে না।

তবু অনাদি শব্দ করে'ই কাঁদলে, এবং পাছে সেটা ভয়ানক দৃষ্টিকটু হয় চপলার মৃতদেহটা সে অনেকক্ষণ দুই হাতে আঁকড়ে ধরে' রইলো।

নইলে সে-শোক কি সত্যি কথা দিয়ে ওজন করা যায়? অনাদি কী করবে বলো, মানুষের পরমতম শোকের মুহূর্ত্তেও কতোগুলি সাধারণ শিষ্টাচার আছে। সেগুলো না মানলে ভদ্রতা বজায় থাকে না।

নইলে অনাদি জানে না কি তার শোকের এই অনির্ব্বচনীয় গভীরতা? কথা মানুষের কতোটুকু প্রকাশ করতে পারে? মানুষের গলার তেজ কতোখানি?

তবু পাঁচজনকে শুনিয়ে অনাদিকে স্পষ্ট কাঁদতে হ'লো। আর, পাঁচজন এমন যে, নিজের কানে না শুনলে কিছু সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। এক কথা শুনতে তখন তারা আরেক কথা শুনে বসে।

এবং এই পাঁচজনকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্যেই সে চপলার ফটোটা ঘরের দেয়াল জুড়ে এন্‌লার্জ করলে।

নইলে অনাদি কি আর জানে না যে চপলা সামান্য ঐ একটা শুধু ছবি নয়? যে তার সর্ব্ব-পরিব্যাপী অনুভূতিতে অসীম হ'য়ে রয়েছে, যান্ত্রিক ঐ একটা ছবি তার কতোটুকু উদ্‌ঘাটন করতে পারে? সঙ্কীর্ণ রেখা দিয়ে তুমি কতোখানি রূপ আনতে পারো, ছায়াতে কতোটুকু শারীরতা?

তবু পাঁচজন তা দেখুক। অনেক সময় দিনের আলোতেও তারা সূর্য্য দেখতে পায় না।

তাই পাঁচজন যখন অনেক ভয়ে-ভয়ে, গরু-চোরের মতো মুখ করে' এসে আমতা-আমতা করে' বললে, অনাদি, এবার আরেকটা বিয়ে কর্, দু'-আঙুলে ছোট্ট তুড়ি মেরে কথাটাকে উড়িয়ে দিতে অনাদির বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হ'লো না। চারপাশে এমনি সে একটা অনড় আবহাওয়া করে' রেখেছে।

সেই রূঢ় বিজ্ঞাপনের সামনে পাঁচজনের আবেদনের কতোটুকু জোর?

নেপথ্য

বলা বাহুল্য, একান্তই সেটা পাঁচজনের জন্যে।

তার নিজের জন্যে সমুদ্রের গর্জ্জন নয়, সমুদ্রের অতলান্ত গভীরতা। পক্ষবিক্ষেপ নয়, শূন্যপ্রয়াণ।

চপলার তিরোধানের পর থেকে জীবনে তার কোনো ছন্দ নেই, সমস্ত একটা সমতল একঘেয়েমি। কোনো বিস্ময় নেই, কোনো প্রত্যাশা নেই, বৈরাগ্যের কোনো একটা সে উদাস রোমাঞ্চ পর্য্যন্ত নেই। সমস্ত একটা অতল অর্থহীনতা।

সমস্ত কিছু প্রাণহীন যান্ত্রিকতা দিয়ে তৈরি। জীবন শুধু বিশাল একটা অভ্যাসের অত্যাচার।

সেই অন্ধ যান্ত্রিকতার নিয়মে অনাদি একদিন একটা গহ্বরে এসে পা দিলো—চপলার তিরোধানের শূন্যতা তার জীবনে যে দৈত্যকায় গহ্বর সৃষ্টি করেছে।

আর আশ্চর্য্য, সেখান থেকে সহজে সে আর উঠে আসতে পারলো না। বলো, কোথায়ই বা সে উঠে আসবে?

কোথায় গেলো তার শোক, তার এতোদিনের বিস্তারিত বিজ্ঞাপন, তার বহুলীকৃত আড়ম্বরের ঘটা, তার অবারিত বিরহের ঔজ্জ্বল্য! হায়, যদি পানীয়ই যেতে পারলো শুকিয়ে, তবে শূন্য পাত্রটা আর থাকে কেন? প্রেমই যদি মরে' গেলো, তবে একটা অস্থিচর্ম্মসার নিষ্ঠা নিয়ে অনাদি কী করবে?

নেপথ্য

বন্ধু অমৃত একদিন তাকে গলির মোড়ে ধরে' ফেললে। বললে,—এ কী কাণ্ড, অনাদি ?

অনাদি মুচকে হেসে বললে,—কোনটা ?

—র‍্যাপারের নিচে ওটা ঐ কিসের পুঁটলি ?

অনাদি বিন্দুমাত্র লজ্জিত হ'বারো ভাণ করলো না ; বললে,—একটা সাড়ি কিনে নিয়ে যাচ্ছি ভাই, আর এই এক বাক্স সাবান।

অমৃতের ঠোঁট দুটো ঘৃণায় ভারি হ'য়ে উঠলো : শেষকালে বাজার করতেও সুরু করেছ দেখছি।

পৃথিবীতে কোথাও যেন এতে কিছুমাত্র এসে যায় না এমনি উদাসীন গলায় অনাদি বললে,—মেয়েটি ভীষণ গরিব, পরবার একটা ভালো সাড়ি নেই। আর জানোই তো, অপরিষ্কার থাকাটা আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

কথা কয়টা অমৃত একটু চিবিয়ে-চিবিয়ে বললে,—তা হ'লে একেবারে প্রেমে পড়ে' গিয়েছ বলো।

—প্রেম ? অনাদি হঠাৎ গলা ছেড়ে হেসে উঠলো : হ্যাঁ, জীবে-দয়াকেও তুমি এক হিসেবে প্রেম বলতে পারো বটে।

—কিন্তু, এমন একদিন গেছে, অমৃত বাঁকা করে' বললে,—যখন তোমার স্ত্রীর জন্যেই অমনি বাজার করে' বাড়ি ফিরতে, অনাদি। এরই জন্যে এতোদিন তুমি বাইরে এতো ফোঁটা-

তিলক কেটে জাঁক করে' এসেছিলে! ছি ছি ছি, শেষকালে কিনা এতোদূর নেমে এসেছ!

—কী আর করা যায়!

—সত্যিই তো, কী আর করা যায়! ঘৃণায় অমৃতের কথাগুলো ধারালো হ'য়ে উঠলো: এতে আর তোমার স্ত্রীর স্মৃতির অবমাননা হচ্ছে না?

যেন কোন অতিকায় মূর্খের সঙ্গে কথা কইছে এমনি অসহায় মুখ করে' অনাদি বললে,—কী করে' হচ্ছে? আমি তো আর বিয়ে করি নি।

—এতোক্ষণে একটা কথার মতো কথা বলেছ বটে! অমৃত তার কাঁধে দুটো সপ্রশংস চাপড় দিলে: কিন্তু বিয়ের কোনখানটায় তুমি বাকি রাখলে? শুধু দু'টো মন্তরেরই কেবল মানে হয়, তা ছাড়া কোনো নিষ্ঠা, কোনো ত্যাগ, কোনো তপস্যারই কিছু দাম নেই?

—যা জানো না তা নিয়ে কথা বলতে আস কেন? অনাদি তার হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে ছটফট করে' উঠলো: যাকে তুমি তপস্যা বলছ, ত্যাগ বলছ, তা আমার অন্তরের জিনিস, এটা শুধু বাইরের একটা অভ্যাস, একটা প্রাণহীন প্রাত্যহিকতা। আমি আজকাল ঠাকুরের রান্না খাই বলে'ও তো বলতে পারো, 'তোমার আর নিষ্ঠা নেই, অনাদি'। আমার

বাইরের পোষাকটা দরিদ্র বলে' আমার বুকের ভেতরটাও একেবারে ফাঁকা, এটা ভাবলে আমার ওপর অবিচার করা হ'বে ভাই।

—বেশ তো, তবে বিয়েই একটা করে' ফেল না কেন। এর চেয়ে সেটা অনেক ভদ্রলোকের কাজ।

—বুঝবে না, তুমি বুঝবে না অমৃত, বিয়ে করলেই আমার হাতে চপলার পরম অপমান ঘটবে, অনাদির গলা হঠাৎ কেমন ঘোলাটে হ'য়ে এলো : মৃত্যুর চেয়েও তার সে বড়ো পরাজয় আমি সহ্য করতে পারবো না।

—আর তোমার এই ব্যবহারে তোমার স্ত্রীর মুখ আহ্লাদে একেবারে আটখানা হ'য়ে পড়ছে, না ?

—কিন্তু তার মুখ অন্ধকারে কালো হ'য়ে ওঠবারো কোনো কারণ নেই। জীবন ধারণের নিশ্চয়ই কোথায় ক্ষমা আছে। আমার যে সময় কাটে না, অমৃত।

—বেশ তো, বিয়ে করলেই তো কেটে যায়। বিকেলটা তখন দু'জনে বসে' দেখা-বিন্তি খেলতে পারো।

—কিন্তু, অলক্ষ্যে অনাদি যেন শিউরে উঠলো : বিয়ে করলে তাকে আমার ভালোবাসতে হ'বে যে।

—একেকটা তুমি কী যে ভীষণ কথা বলো, অনাদি। অমৃত হেসে উঠলো : নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসবে, সে যেন তুমি হনুমানের মতো সাগর লঙ্ঘন করতে যাচ্ছ আর-কি।

—ওঃ, তা হ'লেই তো সব মাটি।

—কী মাটি ?

—আমার এতোদিনকার কল্পনার আকাশ,—সে তুমি বুঝবে না, অমৃত।

—অথচ এইখেনেই বা ভালোবাসার কোন অধ্যায়টা তুমি বাকি রাখলে ? শেষ পর্য্যন্ত বাহারে' পাড়ের খোলতাই রঙের সাড়ি নিয়ে চলেছ। অমৃতর ভুরু দু'টো ঘন হ'য়ে উঠলো : দয়া করে' আমাকে আর কিছু তোমার বোঝাতে হ'বে না। নিজেকে বোঝাচ্ছ, তাই বোঝাও ইচ্ছে মতো।

—একে তুমি ভালোবাসা বোলো না, অনাদির গলা অস্ফুট একটা কাকুতির মতো শোনালো : এ একটা ভিক্ষে। এখানে কিছুই না চাইতে পাওয়া যায় না, অমৃত ; দেবার বেলা হিসেবের খাতা মিলিয়ে দেখতে হয়। এ প্রেম নয়, এ একটা শুধু প্রসাধন।

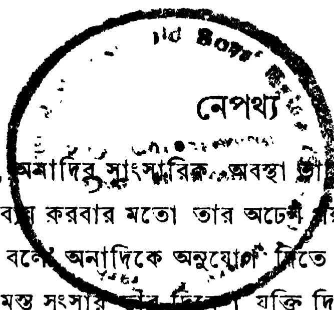
—তেমনি প্রসাধনের অর্থেই আরেকটা বিয়ে করে' ফেলতে তোমার বাধা কী ! অমৃত তীক্ষ্ণ একটা ভ্রূকুটি করলো : শিব সাজবার জন্যে ক'টা লোক আর বিয়ে করতে চায় ? সেইখানেও তো দরকার হ'লে সাড়ি কিনে দেয়া, সময় কাটে না বলে' পাশাপাশি চুপ করে' বসে' থাকা। তার অতিরিক্ত ভালোবাসার কোনো অস্তিত্ব নেই, অন্ততঃ বিবাহিত ভালোবাসার। চরিত্রবানের মতো বিয়েই একটা করে' ফেল,

অনাদি। তোমাব সমস্ত ভালোবাসা চপলা অধিকার করুক, ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমার এই স্ত্রীকে দয়া করে’ পরবার জন্যে সাড়ি, আর গায়ে মাখবার জন্যে সাবান কিনে দিলেই যথেষ্ট।’ এতোতেও যখন তোমার স্ত্রী কিছু আপত্তি করে নি, এটাতেও করবে না। এ-ও তোমার জীবনধারণেবই একটা রসিকতা। বেশ তো, এটাকেও তেমনি সেই অভ্যাসের পর্য্যায়ে নিয়ে এলেই চলবে। অমৃত বিজ্ঞের মতো সূক্ষ্মরেখায় একটু হাসলো: ভয় নেই, তাইতেই তোমার দ্বিতীয়া স্ত্রী, স্বর্গবাসিনীব চেয়েও নিজেকে ধন্য মনে করবেন। বলতে কি, স্ত্রীরা, বিশেষতঃ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীবা, এর অতিরিক্ত আর কিছু বিশেষ চাইতে শেখে নি। ভালোবাসা তাদের কাছে সাড়ি আর সাবান, কাব্যের খানিকটা ধোঁয়া নয়। তোমাকে কষ্ট করে’ আর এক ইঞ্চিও ঊর্দ্ধে উঠতে হ’বে না, অনাদি, যেখানে দাঁড়িয়ে আছো, সেখানেই থাকতে পারবে, মাঝখান থেকে দামি জিনিসগুলি আর অপাত্রে পড়বে না, তোমারো চেহারায় একটা নধব ভদ্রতা আসবে। আরে’ বোকা, এই ভদ্র সাজবার জন্যেই তো বিয়ে করা।

না বললেও চলতো, অনাদি আবার বিয়ে করলে।

যদি তার কারণই একটা শুনতে চাও, অনাদি ক্লান্ত, নির্লক্ষ্য, একেবারে ছন্দোহীন।

এমন একটা ব্যাখ্যায় যদি কেউ খুসি না হও, তবে সত্য কথাই



নেপথ্য

বলা যাক, অনাদির সাংসারিক অবস্থা ভালো নয়, অনর্থক কতো গুলি অপব্যয় করবার মতো তার অঢেল পয়সা নেই।

তাই বলে অনাদিকে অনুযোগ দিতে যাওয়া বৃথা। ধর্ম্ম তার দিকে, সমস্ত সংসার তার দিকে। যুক্তি দিয়ে তার সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না, তার তূনীরে সব অকাট্য বাণ, নির্ম্মম, লক্ষ্যভেদী। অন্তত তার শিশু একটা সন্তান আছে—এ-কথাটা এতোদিন বাদে যেন তার মনে পড়লো—অন্তত তার রক্ষণাবেক্ষণ চাই। তার আছে একটা বয়সের নির্জ্জনতা, মধ্যরাত্রির মতো ভয়াবহ, তার চাই একটা সহজ পরিপূর্ত্তি। আর, বৈরাগ্যের কথাই যদি বলো, অনাদি প্রায় শঙ্করপন্থী—জগৎ মায়া, জীবন অনিত্য। সংসারে কোথায় কী টিঁকে আছে, ধূলো নিয়ে ছ' দিনের হেলাফেলা করে'ই তো সংসার।

অন্তত স্বাস্থ্যটা তা হ'লে ভালো থাকে, সময়ে থাকে একটা স্বচ্ছন্দ ধারাবাহিকতা, সকালে উঠে ঠিক মতো তা হ'লে আপিস করা যায়।

তারি জন্যে যদি বলো অনাদি কোনোদিন চপলাকে ভালো-বাসে নি, তবে গরুর চামড়ায় জুতো হয় বলেই' সে কোনোদিন দুধ দেয় নি এমনি ধরণের একটা বাজে কথা বলা হ'বে। সংসারে মৃত্যুর যতো দিন না আবির্ভাব হয়েছিলো, সেই প্রেম ছিলো, মৃত্যুরো চেয়ে অবধারিত সত্য। সঙ্ক্ষিপ্ত সেই দু' বৎসরের প্রতিটি

মুহূর্ত্ত তো আর তোমরা ছুঁয়ে দেখ নি। তার ছিলো এতো তাপ, এতো তীক্ষ্ণতা। সামান্য একটা কায়িক তিরোধানেই কি তা শূন্য হ'য়ে যাবে মনে করেছ ?

বিয়ে করলে, অন্তত রাঁধুনে বামুনটাকেও তো সে তুলে দিতে পারবে।

তিন

এবার যে মেয়েটিকে অনাদি বিয়ে করলে, আশ্চর্য্য, পৃথিবীতে এতো নাম থাকতে, তার নাম কিনা তরলা।

গরিবের ঘরের লাজুক, গ্রাম্য, ছোট একটি মেয়ে—সাধারণ ঘর-কন্না নিয়ে যার দুই হাত থাকবে ব্যাপৃত—অনাদির আর অকারণ কাব্যলিপ্সা নেই।

কিন্তু যাই বলো, মেয়েটি এমন নয় যার থেকে অনায়াসে তুমি মুখ ফিরিয়ে নিতে পারো, বা একবার দেখলেই তোমার দেখা গেলো ফুরিয়ে। কৃশতায় ছুরির ফলার মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। যখন শুয়ে থাকে, চাঁদের একটি ফালি যেন বিছানায় ভেঙে পড়েছে। পায়ে-পায়ে যখন ছুটে চলে এখানে-সেখানে, যেন জলের শীতল একটি ধারা, নিজের মধ্যে নিজে সে আর আঁটছে না। যখন বা কাজের ফাঁকে-ফাঁকে এমনি কখনো চুপ করে' বসে' থাকে মনে হয় মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে নীল আকাশের কয়েকটি ছোট টুকরো।

তার কৃশতাটি তার দীর্ঘতাকে সমস্ত শরীরে উচ্চারিত করেছে। সেই দীর্ঘতা একটা দীপ্তি। সেই দীর্ঘতা বহন করতে হয় না, বিচ্ছুরিত করতে হয়।

ইদানি ছেলের মা হ'য়ে চপলা কেমন ফুলে উঠেছিলো, হ্যাঁ, স্বাস্থ্যের অকারণ অতি-স্ফীতিতে। এতোদিনে তার শরীর ফিরলো বলে' অনাদিকেও মুখে প্রশংসা করতে হয়েছিলো বটে। কিন্তু স্বাস্থ্য বলতে যা বোঝায় তার চেয়ে সৌন্দর্য্য যে কতো বেশি বোঝায় এ-কথাটা অনাদির বুঝতে তখনো বাকি ছিলো বোধ হয়। দুই হাতের মুঠোতে তরলা কেমন অতি সহজেই ফুরিয়ে যাচ্ছে, তার সেই ফুরিয়ে-যাওয়াটুকুই অসীম। তার সমস্তটি অস্তিত্ব দুর্জ্ঞেয় একটা ইঙ্গিতের মতো তীক্ষ্ণ, অসমাপ্য। ফুরিয়ে গিয়েও সে যেন শেষ হ'তে জানে না। তার উদ্বৃত্তি হচ্ছে এই দীর্ঘতা, ধারালো, উজ্জ্বল দীর্ঘতা।

বাঁধ দিয়ে বন্যা আর তুমি কতোকাল ঠেকাবে? দেয়ালের শুভ্রতা দিয়ে কতো আর অন্ধকার!

তবু অনাদিকে সেদিন বলতে হ'লো: তোমার আর কোনো নাম নেই, তরলা?

ঘুম থেকে উঠে তরলা শুকনো বেণীটাকে খোঁপায় নিয়ে যাচ্ছিলো; বল্‌লে,—বাপের বাড়িতে তরু বলে'ও ডাকে কেউ-কেউ। কেন, আমার নামটা কি তোমার পছন্দ হয় না?

—না, না, খাসা নাম। অনাদি চঞ্চল হ'য়ে উঠলো : ঠিক তোমার পরিষ্কার পরিচয়। তরলা—যেন একটি বহমান অনর্গলতা, কোথাও এতোটুকু বাধা নেই, বিরতি নেই। আমি তোমাকে তরলা বলে'ই ডাকবো। তরুর মধ্যে একটু স্পর্দ্ধার ভাব আছে, অন্যায় একটা পুরুষত্বের দম্ভ। তুমি আমার তরলা—বিগলিত লাবণ্য, নিজেকে বিতরণ করবার অপর্য্যাপ্ত মাধুরী দিয়ে তৈরি। চমৎকার নাম।

কতোগুলি কথা, অথচ মুখ ফুটে বলতে যেতেই অনাদির বুকের ভেতরটা কে মুচড়ে দিলো।

চমকে চাইলো সে চারদিকে। তার মনে হ'লো কে যেন হঠাৎ আড়ি পেতে কথা কয়টা শুনে গেলো, কে যেন কথাগুলির অন্তরালে মলিন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

হ্যাঁ, একদিন চপলা নামটাও তার ভালো লেগেছিলো। সেদিন, আশ্চর্য্য, সেই কথাটাও সে গোপন করতে পারে নি। কিন্তু চপলা-নামের সেদিন সে কী অলৌকিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলো কে বলবে? তার সেই দ্যুতিমান ক্ষণ-স্থায়িতার কোনো আভাসই তো সেদিন সে জানতে পায় নি।

তবু ভালো লেগেছিলো তো। সেই যে মেয়েটা, যার শরীর-চ্ছায়ায় সে একদিন এসে বিশ্রাম নিয়েছিলো, তার নামের কোনো গুণবাচক বিশেষত্ব ছিলো না। সে রাজলক্ষ্মীও হ'তে পারে, বেদানাবালাও হ'তে পারে।

কিন্তু সে ছিলো চপলা। আর, মনে থাকে যেন, তুমি এখন তরলার গুণকীর্ত্তন করছ।

অনাদির বুকটা গুহার মতো ঠাণ্ডা হ'য়ে উঠলো।

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বল্‌লে,—চলো, এখনো তুমি আমার জানোয়ারকে দেখ নি ?

তরলা ভীত, বিস্ফারিত চোখে চারদিকে তাকাতে লাগলো। বললে,—জানোয়ার কে ?

অনাদি মুচকে একটু হেসে বল্‌লে,—বলো তো কে ? পারলে না। আমাদের খোকা।

তরলা ত্রিভুবনে এর কোনো হদিস পেলো না। মুখ ঘুরিয়ে বললে,—এ কী বিচ্ছিরি নাম !

—কেন, মন্দ কী ?

—এর চেয়ে আর কোনো ভালো নাম পেলে না ?

—নাম একটা হ'লেই হ'লো। অনাদির গলা রীতিমতো বিস্বাদ হ'য়ে উঠেছে।

—না, না, সে কী কথা ? অতল স্নিগ্ধতায় তরলার চোথ তু'টি আয়ত হ'য়ে উঠলো : আমি খোকার একটা খুব ভালো দেখে নাম রেখে দেবো।

—তা রেখো, অনাদির গলায় সামান্য একটাও আঁচড় পড়লো না : কিন্তু ডাকবে ওকে ঐ জানোয়ার বলে'।

—এ কী বস্তু আবদার তোমার! তরলা অবাক হ'য়ে স্বামীর মুখের দিকে অপলক চেয়ে রইলো।

—হ্যাঁ, অনাদির গলা কেমন অস্বাভাবিক গাঢ় হ'য়ে এসেছে: ঐ ওর মায়ের দেয়া নাম। ও হ'তে খুব কষ্ট পেয়েছে বলে' ওর মা ওকে তাই বলে' আদর করতো। তা, কী বলো, ডাক-নাম একটা হ'লেই হয়, অনাদি তরলাকে হঠাৎ প্রবোধ দেবার জন্যেই যেন কাছে টেনে আনলো: তুমি খুব ভালো দেখে ওর একটা পোষাকি নাম রেখো, কেমন? কী রাখবে বলো দিকি?

কী নাম যে সে রাখবে তা স্বামীর উদাস, ভারাক্রান্ত দুই চোখের দিকে চেয়ে সেই মুহূর্ত্তে সহসা সে কিছু ভেবে ঠিক করতে পারলো না।

তবু, অচেনা, অনাত্মীয় সেই খোকাকে নিয়ে উচ্ছৃঙ্খল নাড়া-চাড়া করবার জন্যে তরলার দুই হাত স্নেহে হঠাৎ আঁকুবাঁকু করে' উঠলো।

বছরও হয়তো পোরে নি, রাশীভূত নমনীয়তা। দেখলেই কেমন অনাস্বাদিত ব্যথায় বুকের ভেতরটা টনটন করে' ওঠে।

ঢেউয়ের মতো তরলা তার দু' বাহু উচ্ছ্বসিত করে' দিলো।

কিন্তু, জানোয়ার তো জানোয়ার, খোকা কিছুতেই তার কোলে আসবে না, কেবল কাঁদবে, ছাড়া পাবার জন্যে হাত-পা ছুঁড়ে প্রাণ-পণ তারস্বরে চীৎকার পাড়বে। দুর্ব্বল এক টুকরো শিশু, কিন্তু

স্বভাবে যেন তার বাঘের হিংস্রতা। তোমার কী আছে যা দিয়ে তাকে তুমি ভোলাতে পারো? এনে দাও তাকে চুষিকাঠি, টিনের ঝুমঝুমি, স্তূপীকৃত খাবারের পাহাড়—কিছুতেই তার শান্ত হবার নাম নেই। কোল ভরে' দাও তাকে অজস্র কোমলতা, তার মুখের পাতা পড়ছে না। ডাকো তাকে ছোট-ছোট আদরের ভাষায়, কিন্তু বন্যতায় সে বধির।

তা কাঁদুক, অচেনা লোক দেখলে ছোট ছেলেপিলেরা একটু কেঁদেই থাকে, তরলা তাকে কোল থেকে বুকের উপরে নিয়ে এলো, স্নেহের ব্যাকুলতায় উৎসারিত হ'য়ে পড়লো—জানোয়ারের গর্জ্জনের তবু বিরাম নেই।

কী তুমি তাকে দিতে পারো, তরলা অগত্যা দুধের বোতল এনে তার মুখে পুরলে।

বিষম খেয়ে ছেলেটা প্রায় যায় আর কি।

পাশের ঘর থেকে অনাদি এলো হাঁ-হাঁ করে' ছুটে: কী হ'লো? কী করলে তুমি ছেলের?

লজ্জায় বিবশ চক্ষু নামিয়ে তরলা কুণ্ঠিত গলায় বললে,—ভারি দুষ্টু ছেলে, কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না।

—না, না, তুমি পারবে না, আন্নাকালিকে ডাকো। অনাদি সামনে এক পা এগিয়ে এসে সূক্ষ্ম চোখে কী-একটা পর্য্যবেক্ষণ করতে-করতে বললে,—আগে তো কোনোদিনও এমন কাঁদতো

না, একতাল মাটির মতো পড়ে' থাকতো। ও শুধু নামেই জানোয়ার, ব্যবহারে একেবারে জল। এই এতোদিন ও সমানে বোতলে করে' দুধ খেয়ে এসেছে, কই, বিষম লাগতে তো দেখিনি কখনো।

আন্নাকালি এ-বাড়ির ঝি। প্রথম যখন চাকরি নিয়ে অনাদি সস্ত্রীক এখানে আসে, তখন থেকেই সে আছে।

—দাও, দাও, আমার কাছে দাও। ডাক শুনে হাতের কাজ ফেলে আন্নাকালি এক দৌড়ে ছুটে এলো: কোলের গরমে ছেলেটাকে যে একেবারে কাহিল করে' ফেলেছ। হাত বাড়িয়ে মশারির চাল থেকে পাখা-গাছটা পেড়ে দাও শিগগির। নিজের পেটে না ধরলে কি আর ছেলে বশ করা যায়? তরলার কোল থেকে আন্নাকালি একরকম জোর করেই' খোকাকে ছিনিয়ে নিলো।

অমনি, আশ্চর্য্য, দেখতে-দেখতেই ভোজবাজি। ফুটন্ত দুধে একটু সাইট্রিক য়্যাসিড দিলেই যেমন তা মুহূর্ত্তে ছানা হ'য়ে যায়, তেমনি আন্নার কোলে গিয়ে খোকার সমস্ত কান্না স্তব্ধতায় নিটোল হ'য়ে উঠলো।

পৃথিবীর সমস্ত লজ্জা নিয়ে তরলা মুহ্যমানের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। ঐ একতাল নমনীয় মাংস, তার মাঝে এতো বিষাক্ত হিংস্রতা! আশ্রয়-ভিখারী দুর্ব্বল একটা শিশু, তার মাঝে এই উদ্ধত বিদ্রোহ!

খোকার এই স্তব্ধতা যেন কা'র প্রবল অট্টহাস্য দিয়ে তৈরি। সমস্ত স্নায়ুতে তরলা ছটফট করে' উঠলো। খোকা তো চুপ করে' নেই, যেন কে তার মসৃণ, নিষ্ঠুর দাঁতে উলঙ্গ হেসে উঠেছে।

সাহস করে' তরলা আবার খোকার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো, আনন্দে অস্ফুট গলায় বললে,—এসো।

আর কোন দুঃস্বপ্নের মধ্যে থেকে খোকা উঠলো হঠাৎ চীৎকার করে'।

অনাদি হাসিমুখে তরল গলায় বললে,—ব্যাটা তো দেখছি ভীষণ স্বার্থপর, তোমাকে মা বলে' স্বীকারই করতে চায় না।

অপরাধের লজ্জায় তরলার দু' চোখের পাতা ভারি হ'য়ে এলো। সে না-হয় তাকে পেটেই ধরে নি, কিন্তু তাই বলে' তার বুকে কি সেই একই সুধা সঞ্চিত হ'য়ে নেই? নরম, অসহায় ঐ একটুখানি খোকা, তাকে কি সে কখনো আপনার করে' তুলতে পারবে না?

রাত্রে খোকা আন্নাকালির ঘরে শোয়, আর এমনিই চুপ করে' সে ঘুমোয় যে তরলার বুকটা স্তব্ধতায় হাহাকার করে' ওঠে।

—এ কি, কোথায় উঠছ? মশারির চাল তুলে খাটের থেকে তরলাকে চুপি-চুপি নামতে দেখে ভয় পেয়ে অনাদি তার আঁচল চেপে ধরলো।

—যাই খোকাকে এখানে নিয়ে আসি। তরলা ধরা-পড়া লজ্জিত গলায় বললে।

—এখানে, অনাদি চমকে উঠলো : এখানে নিয়ে আসতে যাবে কেন ? ওখানে ও দিব্যি ঘুমোচ্ছে।

—না, আমার কাছে, আমার বিছানায় ও ঘুমোবে। তরলা অনুনয়ের ভঙ্গিতে খাটের পাশ ঘেঁসে এসে দাঁড়ালো : কোলের ছেলে আবার কখন আলাদা ঘরে গিয়ে ঘুমোয় !

—কিন্তু ও যে আন্নাকালির ভারি ন্যাওটা।

—তেমনি আমারো হ'তে বা বাধা কী ? অন্ধকারে তরলা করুণ করে' একটু হেসে উঠলো : আমি তো আর ঐ তোমার ঝি-র চেয়ে এমন কিছু খারাপ দেখতে নই। আমার হাত দু'টো তো আর বাঘের থাবা নয়।

তরলাকে হঠাৎ যেন নিশি-পেয়েছে। নইলে, কিছুর মধ্যে কিছু নয়, ঘুমের মধ্যে থেকে উঠে সে চলেছে ছেলের সন্ধানে, চুপি-চুপি, চোরের মতো। এমন কথা কে কবে শুনেছিলো ?

অনাদি বিরক্তিতে বিস্বাদ গলায় বললে,—কেন মিছিমিছি দিক্ করছ ? ওটাকে এখানে নিয়ে এলেই ভীষণ ভ্যাবাতে সুরু করবে।

—তা ছোট ছেলেপিলে একটু কাঁদেই। তাতে ঘুমের ব্যাঘাত হয় বললে চলবে কেন ?

মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে না পেরে অনাদি শোয়া ছেড়ে উঠে বসলো: এ কী মজার কথা, তাই বলে' শুধু-শুধু তুমি ছেলে কাঁদিয়ে আমার এই পাকা ঘুমটা নষ্ট করে' দেবে? ওর সেই ছাদ-ফাটানো কান্নাটাই কি এখন তোমার খুব ভালো লাগবে নাকি?

—তা, শোনবার কান থাকলে লাগবে বৈ কি ভালো। স্খলিত পায়ে তরলা দরজার দিকে এগিয়ে এলো: কোথাকার কে-একটা ঝি-র কাছে শুয়ে চুপ করে' ঘুমোনোর চাইতে মা'র বুকে মুখ রেখে তার সত্যিকারের কাঁদাটা অনেক ভালো শোনাবে।

অনাদির বুকটা একেবারে জুড়িয়ে গেলো মনে কোরো না। মশারির বাইরে চলে' আসতে-আসতে সে ঈষৎ রুক্ষ গলায় বললে, —কিন্তু সেটা ছেলের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো না-ও হ'তে পারে, তরলা। শোনো, দাঁড়াও, শুধু আমার ঘুমের ব্যাঘাতের কথা বলছি না, সমস্ত রাতে ছেলেটারো আর চোখের পাতা দুটো একত্র করতে পারবে না। মিছিমিছি ওকে ব্যস্ত করে' লাভ কী? সম্প্রতি ওর সম্মানের চেয়ে ওর স্বাস্থ্যটাই কি বড়ো জিনিস নয়?

তরলা দু' পায়ে অনড় দাঁড়িয়ে রইলো।

পিছন থেকে অনাদি শ্লথ পায়ে এগিয়ে এসে তাকে সস্নেহ আকর্ষণ করলে। বললে,—ওর জন্যে তোমাকে ভাবতে হ'বে না, তরলা। ওর জন্যে লোক আছে। আমারই জন্যে কেউ নেই। আমারই ভাবনা ভাববার জন্যে তোমাকে নিয়ে এসেছি।

স্বামীর সেই স্পর্শে তরলা হঠাৎ নিজেকে ভারি অপরিচ্ছন্ন মনে করলে।

সমস্ত রাতে সেই শুধু দু' চোখ একত্র করতে পারলো না। থালি কান পেতে রইলো কতোক্ষণ একটি শিশু-কণ্ঠের আনন্দিত আর্ত্তনাদে সমস্ত অন্ধকার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে।

এবার যথন তরলা উঠে বসলো, তথন অনাদিকে সে এতো-টুকুও পাশ ফিরতে দিলো না। অতি সন্তর্পণে, সঞ্চরমান একটা ছায়ার মতো টলতে-টলতে সে দরজার দিকে এগিয়ে এলো। দরজাটা যেন তার হ'য়ে কে আলগোছে খুলে দিলে।

না, এখানে সে শুধু অনাদির জন্যে আসে নি। অনাদি যদি তার, তবে যেখানে যতোটুকু অনাদির আধিপত্য আছে, সব খানেই তার সমান অধিকার, তার সমান বিস্তৃতি। কিছুই সে ফেলতে পারবে না। যদি দাহ তাকে দিতে হয়, দীপ্তিও তাকে দিতে হ'বে।

কিন্তু আন্নাকালি যে একেবারে দরজা বন্ধ করে' ঘুমোয় এ আবার কে জানতো বলো ?

দরজায় ধাক্কা দিতে তরলার সাহস হ'লো না। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে আরো থানিকটা লম্বা হ'য়ে সে জানলা দিয়ে একবার মুথ বাড়ালো।

নড়বড়ে একটা তক্তপোষে, প্রায় কাঠেরই ওপর বসতে

পারো, খোকা আন্নাকালির আঁচলের তলায় দিব্যি অঘোরে ঘুমঃ যাচ্ছে।

আর সে শুয়ে ছিলো ফাঁপানো গদির কোমলতায়। তার দুই চোখে কিনা তবু এক ফোঁটা ঘুম আসছিলো না।

দরজার উপরে তরলা তার কপাল কুটতে চাইলো। হায়, সে শুধু এখানে অনাদির জন্যেই এসেছে, আর ঐ খোকা, ঐ খোকা তার কেউ নয়।

সে যেন শুধু একটা জলাশয়, প্রয়োজনের পাথর দিয়ে বাঁধানো, নয় যেন সে নদী, নিজের বেগে বহমান, নিজের মুক্তিতে উৎসারিত। সে যেন এসেছে স্ত্রী হ'য়ে, মা হ'য়ে নয়।

খাঁচার পাখীর মতো তরলা পাখা ঝাপটাতে লাগলো।

চার

কিন্তু, যাই বলো, জানোয়ারের দিকে দু' চোখ মেলে তাকানো যায় না।

খালি গায়ে ধুলো-বালি মেখে কদাকার হ'য়ে বসে' আছে। সোহাগিনী আন্নাকালির সেদিকে নজর দেবারো দরকার নেই।

তরলার আর সহ্য হ'লো না, অথচ, কর্কশ হ'তে গিয়ে কেমন করুণ করে' বললে,—ছেলেটার এ কী হাল করে' রেখেছ?

আন্নাকালি দালানে বসে' সুপুরি কাটছিলো। কথাটার জবাব দেয়া দূরে থাক, সে-কথা শুনে অন্তত যে একবার খোকার দিকে চেয়ে দেখবে ততোটুকুও যেন তার কৌতূহল নেই।

—আমাকে তো ধরতে-ছুঁতে দাও না দেখি, কিন্তু সকাল থেকে ছেলেটাকে যে ঐ মাটির উপর ফেলে রেখেছ এটা তোমার কোন দিশি কাণ্ডজ্ঞান জিগ্‌গেস করি?

চোখ না তুলে পরম উদাসীনের মতো আন্নাকালি বললে,—আমাকে তোমার কিছু শেখাতে হ'বে না। নিজের কাজ করো গে যাও।

—কিন্তু ওর দেখা শোনা করাও আমার নিজের কাজ সেটা কিছু খেয়াল রাখো ? তরলা গর্জ্জন করে' উঠলো।

কিন্তু আন্নাকালির গলায় ঝগড়ার কোনো উৎসাহ দেখা গেলো না। কথা কয়টাকে চিবিয়ে-চিবিয়ে বললে,—নিজে পেটে ধরলে তখন ছেলের দেখা শোনা করতে এসো।

—কিন্তু তুমি কে ? তুমিই কি ওকে পেটে ধরেছ নাকি ?

—আমি কে, আন্নাকালি দীর্ঘ একটা ঢোঁক গিললে : সে-কথা তোমাকে যে বলতে পারতো সে আজ বেঁচে নেই। সে আজ বেঁচে নেই বলে'ই আমাকে কিনা হায় সে-কথার জবাব দিতে হচ্ছে।

—তুমি তো একটা ঝি। তোমাকে মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে। তরলা টগবগ করে' উঠলো।

—তাতে লজ্জার কিছু নেই, ছোট বৌ। আন্নাকালি তার নির্দন্ত মুখে নির্বারিত হেসে উঠলো : বলতে গেলে, তোমাকেও তো মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে।

—কিন্তু তুমি তোমার মাইনের যোগ্য কাজ করছ না কেন শুনি ? রান্নাঘর থেকে তরলা দালানে এসে পা দিলো : ছেলের

দেখা শোনা করার জন্যেই যদি তুমি মাইনে পাও, তবে ওটা যে অমনি মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে তুমি দেখতে পাও না ?

—তুমিও দয়া করে' চোখ দিয়ো না ওদিকে। আন্নাকালি সুপুরি কাটতে লাগলো : আমার কাজ আমি বুঝবো।

—তোমাকে বোঝানো হচ্ছে। ব্যস্ত, দ্রুত পায়ে উঠোনে নেমে তরলা জানোয়ারকে সবেগে কোলে নিতে গেলো।

যেন বাড়ি-ঘর হঠাৎ চুরমার হ'য়ে ভেঙে পড়ছে এমনি উদ্বেল ত্রস্ততায় আন্নাকালি থাক-থাক চীৎকার করে' উঠলো : ধ'রো না, খবরদার, ওকে ধ'রো না বলছি।

সামনে যেন একটা কী মূর্ত্তিমান বিভীষিকা, তরলা স্তম্ভিত হ'য়ে রইলো।

জানোয়ারকে তাড়াতাড়ি' কোলে নিয়ে দুই হাতে গা তার মোছাতে-মোছাতে আন্নাকালি ভীত, বিহ্বল গলায় বললে,—সৎ-মার হাতে ওকে তুমি বার-বার ছুঁতে আস কেন বলো দিকি ? বাছার একটা কিছু অমঙ্গল হোক এই বুঝি তুমি মনে-মনে মানৎ করে' আছো ?

তরলা এক .ধাক্কায় ঘরের মধ্যে মেঝের উপর এসে ছিটকে পড়লো।

অনাদি ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালো, ব্যাকুল হ'য়ে বললে,—এ কী, কী হ'লো তোমার ? কোনো অসুখ-বিসুখ করলো নাকি ?

তরলা তক্ষুনি আবার এক ঝটকায় সোজা হ'য়ে উঠে বসলো : তুমি ঐ ঝিটাকে এক্ষুনি বিদেয় করবে কিনা বলো ?

—কে, আন্নাকালি ? কথাটা যেন অনাদি বিশ্বাস করতে পারছে না।

—হ্যাঁ, ষোড়শোপচারে যাকে পুজো করছো দিন-রাত।

—কেন, কী করলো ? তার ওপর হঠাৎ তুমি এমন চটে' গেলে কেন ?

—না, তাকে কাঁধে করে' নিয়ে নাচবে ? অভিমানে ভর-ভর দুটি চোখ তুলে তরলা স্বামীর মুখের দিকে তাকালো : আমাকে আজ ও কী বললে জানো ?

—কী বললে ?

—বললে, দিনে-রাতে আমি নাকি কেবল খোকার অমঙ্গল কামনা করি।

—কা'র ? অনাদি খোলসা করে' ব্যাপারটা যেন কিছু বুঝতে পারলো না : জানোয়ারের ?

—হ্যাঁ, অমন ছেলের বাপ না হ'লে মাথাটা এমন তোমার নিরেট হ'বে কেন ? তরলা সমস্ত শরীরে রি-রি করে' উঠলো : আর, এতো বড়ো তার মুখ, বলে কিনা, সৎ-মার হাতে তুমি ওকে ছুঁতে এসো না, ছোট বৌ।

অনাদি অনর্গল হেসে উঠলো : এই কথা ?

—এই কথা মানে ? তরলার রাগে সমস্ত আবহাওয়াটা যেন ভাপিয়ে উঠলো : তুমি এর একটা কিছু বিহিত করবে না ?

অনাদি কথাটাকে উড়িয়ে দিলে : গেঁয়ো একটা ছোটলোকের কী-একটা না কথা, তা তুমি অতো গায়ে মাখতে গেলে কেন ?

—তাই বলে' সামান্য ঝি হ'য়ে ও আমাকে অপমান করে' কথা কইবে ? আর তাই তুমি আমাকে দাঁড়িয়ে শুনতে বলো ?

অনাদি নির্ব্বিকারের মতো বললে,—এতে তুমি অপমান কোথায় দেখতে পেলে ?

তরলা অনড় একটা কাঠ হ'য়ে রইলো : অপমান নয় ? এতে কিছুই অপমান নেই, বলো ? আমি সৎ-মা, সেটা কি আমার অপরাধ ? আমি এখানে এসে সমস্ত পাবো, শুধু আমার ছেলে ফিরিয়ে পাবো না ? ও কে যে সমস্তক্ষণ সেই ছেলে আমার আড়াল করে' রাখবে ? ওর নোংরা হাতে ছেলে ধরলে জাত যায় না, আর আমি একটু ছুঁতে গেলেই তার অমঙ্গল হয় ?

এতোতেও যেন অনাদিকে উত্তপ্ত করা গেলো না। সে তেমনি ঠাণ্ডা, নিশ্চিন্ত গলায় বললে,—ওর মিথ্যে একটা কুসংস্কারের ওপর রাগ করে' লাভ কী ?

—কুসংস্কার ? তরলা রাগে বরফের মতো জমে' উঠলো।

—হ্যাঁ, ছোটলোকদের মধ্যে এমনি ধারা একটা কুসংস্কার আছে এদিকে।

—যে সৎ-মা হ'য়ে এসে' ছেলের দেখা শোনা করলে সেই ছেলের অমঙ্গল হয় ?

—হ্যাঁ, অনাদির মুখে বিশীর্ণ একটি হাসি ফুটে উঠলো : যতোদিন না সেই সৎ-মা নিজে সন্তানবতী হচ্ছে।

—তুমি তা সমর্থন করো ? কথাটা তরলা অনাদির মুখের উপর সবেগে ছুঁড়ে মারলো।

—বা রে, আমি কিছু সমর্থন করতে যাবো কেন ? অনাদি এগিয়ে এসে তরলার একখানি হাত ধরতে গেলো : কিন্তু আমি বলি কী, এই হ্যাঙ্গাম-হুজ্জুৎ করে' কিছু লাভ নেই। যেমন বরাত করে' এসেছে, থাক ও ওর ঝি-র জিম্মায়।

—কেন, কেন, আমার ছেলে কেন ঝি-র হাতে মানুষ হ'তে যাবে ?

—পাগল ! তার তো দিন এখনো ফুরিয়ে যায় নি। হাসিতে অনাদিকে কেমন এখন পাশবিক দেখালো : তখন তাকে দিয়ে তোমার কোল ভরে' রেখো, কারু সাধ্যি নেই তোমাকে কিছু বলতে আসে। এখন ওকে কোলে নিতে গেলেই, দেখতে পাচ্ছ তো, একেবারে যুগপ্রলয়।

অনাদির হাতটা জোরে ঠেলে দিয়ে তরলা একছুটে উঠোনে এসে হাজির।

একমনে জানোয়ার তখনো ধূলো-বালি নিয়ে খেলা করছে।

আন্নাকালি বেঁচে আছে কি মরে' গেছে, তরলা কোনো দিকে দৃকপাত করলো না, দুই হাতে সবলে জানোয়ারকে কোলের উপর তুলে নিলো।

আর জানোয়ারের গায়ে যতো জোর ছিলো সব সে তার মুখের গহ্বরে এনে সমবেত করলে।

সে-কান্না শুনে তরলারো কেমন কাঁটা দিয়ে উঠেছিলো, মনে হয়েছিলো এ যেন মানুষের কান্না নয়, তবু কোনো কিছুতে তার দখল ছাড়বার কথা আর সে আমোলেই আনতে পারলো না।

—রাজ্যের নোংরা ঘেঁটে কী করেছে দেখ! তরলা জোর করে' তার সর্ব্বাঙ্গে আঁচল বুলোতে লাগলো: হাতে কী ওটা তোর দস্যি ছেলে, ওমা, আস্ত কী একটা পোকা কিলবিল করছে! মুখে পুরে দিলেই তো গেছলো।

—এমনিতে খেতে আর কিছু বাকি নেই। আন্নাকালি কোথা থেকে বেরিয়ে এসে গলায় একটা ভারিক্কি টান দিলে: ওকে নামিয়ে দাও, ছোট বৌ।

—তুমি আমার ওপর হুকুম করতে এসো না বলছি। তরলা চোখ পাকিয়ে বললে।

—কিন্তু কী ভীষণ ও কাঁদছে শুনতে পাচ্ছ না?

—কাঁদছে তো বেশ করছে। একশোবার কাঁদবে। আরো কাঁদবে। বলে' তরলা খোকার গালে হঠাৎ একটা ঠোনা বসিয়ে

দিলো : আমার ছেলে আমার বাড়িতে বসে’ যতো খুসি কাঁদবে, তাতে তোমার কী ?

—ওমা, গালে হাত দিয়ে আন্নাকালি একেবারে মাটির উপর বসে’ পড়লো : তাই বলে’ তুমি ঐ দুধের বাচ্চাটাকে অমনি ধারা মারবে নাকি গা ?

—কে, কে মারলো ? ঘরের ভিতর থেকে অনাদি এলো ছুটে।

—মা মারবে না তো মাইনে-করা একটা ঝি ওর গায়ে হাত তুলবে নাকি ভেবেছ ? প্রসারিত ধনুকের মতো হাত-পা বেঁকিয়ে জানোয়ার প্রাণপণ শক্তিতে তার কোল থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলো, তরলা তাকে দুই বলিষ্ঠ হাতে কাঁধের উপর সাপটে ধরলো : বেশ করবো, মারবো। আমি মা, ছেলে আমার।

—এ কী আরম্ভ করেছ সকালবেলা ? অনাদির গলা বিরক্তিতে ঝাঁজিয়ে উঠলো : বাড়িতে টিকতে দেবে না নাকি ?

—তুমি এর মধ্যে কেন মাথা গলাতে আস বলো তো ? তরলা এবার স্বামীর উপর মুখিয়ে এলো : যা জানো না, বোঝো না, সব-তাতে তোমার মাতব্বরি করতে আসবার মানেটা কী ?

—আমি অতোশতো কিছু বুঝতে চাই না, সানুনয় অথচ অসহিষ্ণু গলায় অনাদি বললে,—দয়া করে’ ওটাকে আন্নাকালির কোলে নামিয়ে দাও, বাড়িটা একটু ঠাণ্ডা হোক।

—বাড়িতে বেশি তাত মনে হয় তো ঐ আমবাগানের ছায়ায়

বসে' হাওয়া খাও গে। তরলা খোকাকে মুচড়ে দুমড়ে কোলের ওপর চেপে রাখতে-রাখতে কুয়োর দিকে এগোতে লাগলো : ছেলে যখন বড়ো হ'য়ে ইস্কুলে পড়তে যাবে তখন তার ভালো-মন্দ নিয়ে তম্বি করতে এসো, এখন যতোক্ষণ ও আমার এলেকায় তখন কারু আমি মুখ-নাড়া সইতে পারবো না।

শুকনো হাড়ে ঠক-ঠক করতে-করতে আন্নাকালি বললে,—এ কী বোম্বেটে মেয়ে, বাবা! রাত-বিরেতে এ যে দস্তুরমতো ডাকাতি করতে পারে।

কিন্তু, বলা বাহুল্য, তরলা আর কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না। নিজ হাতে জল তুলে জানোয়ারকে স্নান করিয়ে দিতে লাগলো।

—কাঁচা জলে চান করিয়ে ওর বুকে যে একেবারে সর্দ্দি বসিয়ে ছাড়বে। আন্নাকালি আবার একটা আর্ত্তনাদ করে' উঠলো।

কতোটুকু জলে কতোখানি সর্দ্দি হয় সে-কথা তরলাকে যেন কেউ ঠাট করে' শেখাতে না আসে, এমনি উদার ঔদাসীন্যে সাবান দিয়ে রগড়ে-রগড়ে ছেলেকে সে স্নান করালো। নিজের ট্রাঙ্ক থেকে মোটা, খসখসে, রোঁয়া-ওঠা তোয়ালে বা'র করে' শুকনো করে' দিলে সমস্ত গা। ট্যালকাম পাউডার দিয়ে তাকে সাদা, পিছল করে' তুললো। গায়ে দিয়ে দিলো সব চেয়ে রঙিল, নতুনতম একটা জামা, যার পাট ভাঙতে দৃষ্টি-কৃপণ আন্নাকালির এখনো

সাহস হয় নি। ভালো করে' চুল ওঠে নি, তবু সে সাধ্যমতো সিঁথি কেটে দিলে। কপালে দিয়ে দিলো লাল কালির টিপ। কাঁদছে কাঁদুক, তাতে তরলার গ্রাহ্য নেই, এখন চোখে একটু কাজল পরাতে পারলেই তার হ'য়ে যায়।

দেয়ালে-বেঁধা সেই আলমারির মধ্যে কাজল-লতাটা একধারে পড়ে' আছে।

ব্যস্ত হ'য়ে ঘরে ঢুকে তরলা সটান অনাদির দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো: দাও দিকি আলমারির চাবিটা! অনাদিকে যেন কে একটা ঘা দিলে: কেন, আলমারির চাবি দিয়ে তুমি কী করবে?

—আলমারির চাবি দিয়ে আবার মানুষে কী করে? দাও, তরলা ছটফট করে' উঠলো: বাজে কথা কইবার আমার সময় নেই।

অনাদি পাংশু মুখে জিগ্‌গেস করলে: কিছু নেবে নাকি ওখান থেকে?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, এতোক্ষণে মশায়ের বুদ্ধি খুলেছে। কী আর হ'বে, তরলা হেসে ফেললো: ছেলেরই তো বাপ।

—কী নেবে শুনি?

—কাজল-লতা। খোকার চোখে কাজল এঁকে দেবো। আমার কাঁদুনে ছেলেটা কেমন সাজলো আজ, একটিবার দেখলেও না তো

চোখ ভরে'। তরলা ফের হাত বাড়ালো: দাও, আমি দাঁড়াতে পাচ্ছি না। আমাকে গিয়ে এখন আবার ওর খাবার জোগাড় করতে হ'বে।

অনাদির গলা গভীর নিস্পৃহতায় হঠাৎ ডুবে গেলো: এই কথা? তা, তার জন্যে আলমারি খোলবার কী দরকার? কলাপাতায় তেল মেখে একটু কাজল করে' নিলেই হয়।

—কলাপাতা, কলাপাতা আমি এখন কোথায় পাবো?

—তা বলো তো, অনাদি জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো: আমি গিয়ে কেটে আনছি।

—কিন্তু, কেন, হাতের কাছে আলমারিটা খুলতে বাধা কী? তরলা সন্দিগ্ধ চোখে অনাদিকে একবার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো: কাজল-লতাটা তবে কী জন্যে ওখানে তুলে রাখা হয়েছে?

—যেমন রয়েছে তেমনি থাক্ না। মিছিমিছি ওখানে হাত দিয়ে লাভ কী?

—মিছিমিছি কোথায়?

—বা রে, অনাদি আমতা-আমতা করে' বললে,—কলাপাতায় যখন কাজ চলে' যাচ্ছে, তখন ওটা মিছিমিছি নয়?

—সকালবেলা তোমার সঙ্গে আমি বাজে তর্ক করতে চাই না। তরলা শাসনের ভঙ্গিতে বললে,—দিয়ে দাও বলছি চাবিটা।

ওটা আমার ছেলের জিনিস, আমার ছেলের কাজে লাগবে, ওতে তোমার কোনো দায়-দাবি নেই।

অনাদি গম্ভীর হ'য়ে বললে,—না।

—কী না?

—ঐ আলমারিতে হাত দেয়া যাবে না।

—কেন?

অনাদি গলাটা বুঝি একবার খাঁথরে নিলো: ওটা ওর মা'র হাতে সাজানো।

তরলার গলা দিয়ে বেরুলো: কা'র হাতে সাজানো?

—ওর মা'র হাতে। কতোদিন থেকে কতো যত্ন করে' সে সব থরে-থরে সাজিয়ে রেখেছে।

নিমেষে সমস্ত পৃথিবী তরলার চোখে অন্ধকার হ'য়ে গেলো। তবু প্রাণপণে দুই চোখ খুলে' রেখে সে জিগ্‌গেস করলে: তাতে কী? কোথায় ওর মা? সে তো মরে' কবে ভূত হ'য়ে গেছে।

—তবু জিনিসগুলো তো আছে। অনাদি একটা নৈর্ব্যক্তিক উক্তি করলে: সত্যি করে' বলতে, পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে প্রাণহীন জিনিসগুলিরই আয়ু বেশি।

—কেননা একটা জিনিস ভাঙলে তাড়াতাড়ি তুমি আরেকটা বাজার থেকে কিনে আনতে পারো। কাজল-লতা না জুটলে

কলাপাতা আছে। তরলা ঘৃণায় একেবারে লেলিহান হ'য়ে উঠলো : কেবল মানুষের বেলায়ই তা হয় না।

বলে' দ্বিরুক্তি না করে' ছেলে কোলে নিয়ে সে দ্রুত-পায়ে প্রস্থান করলে।

এবং একেবারে আন্নাকালির ঘরে।

ছেলেকে দুম করে' তার পাশে নামিয়ে দিয়ে তরলা চাপা রাগে আচ্ছন্ন গলায় বললে,—নাও, নাও তোমাদের ছেলে। কে আর ওকে ধরতে চায়? সব খুলে-টুলে আবার ওকে ভূত সাজিয়ে দাও।

আন্নাকালি তো অবাক। কিন্তু তারো চেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে খোকার স্তব্ধতা।

সেটা স্তব্ধতা নয়, সেটা একটা প্রেতায়িত অট্টহাস্য। সেটা একটা তীক্ষ্ণ ও নিষ্ঠুর ধিক্কার ছাড়া কিছু নয়।

তরলা তার অন্তরের ভয়াবহ নির্জ্জনতায় এসে আত্মগোপন করলে। হায়, তারই ছিলো ছেলে, কিন্তু সে-ই মা হ'য়ে উঠতে পারলো না।

তাই,—এতোদিনে সব তরলা জলের মতো পরিষ্কার বুঝতে পারছে। তাই মাস ফুরিয়ে গেলেও ক্যালেণ্ডারের পাতাটা ছেঁড়া হয় নি—সেই অক্টোবর মাস তেমনি জ্বলজ্বল করছে। জানলায় যে পর্দ্দাটা ঝুলছে, ধোঁয়ায়-ধূলোয় নোংরা হ'য়ে এলেও তা

ধোপাবাড়ি দেবার নাম নেই। বলতে গেলেই অনাদি একেবারে তার মাইনের হিসেব দিতে বসে' গেছে: এতো সামান্য আয়ে ধোপাবাড়ির বাবুগিরি কি আর পোষা যায়? সত্যিই তো, সেটা যে তার নিজের হাতে সেলাই-করা। যদ্দিন আছে থাক না অমনি—তাতে কী এমন এসে যাচ্ছে? তাই, তাই সেদিন চায়ের বাটিতে টান পড়লে অনাদি দোকান থেকে তক্ষুনি এক সেট চায়ের বাসন কিনে নিয়ে এলো, অথচ আলমারিতে শূন্য পেয়ালাগুলো ঝক্‌ঝক্‌ করছে! হ'বেই তো, মানুষের চেয়ে জিনিসেরই যে আয়ু বেশি।

হয়তো তার দামও বেশি—তরলা দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

কে জানে,(হয়তো সে-ও শুধু একটা জিনিস। জিনিস হ'বার জন্যেই তার যতোটুকু দাম।)



পাঁচ

তারপর থেকে তরলা একেবারে চুপ করে' গেলো।

তার কেবলই মনে হ'তে লাগলো এটা যেন তার নিজের জায়গা নয়, সে যেন এসে নির্লজ্জের মতো কা'র অংশে একটা রূঢ় দাঁত বসিয়েছে। সমস্ত সংসারে কা'র ছায়া রয়েছে ছড়িয়ে—কা'র তিরোধানের ছায়া। ফাটল-ধরা দেয়ালের আঁকাবাঁকা রেখা থেকে সুরু করে' কড়িকাঠের ঝুলে। সমস্ত সংসার কে যেন দীর্ঘ, শীর্ণ হাতে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাতাস কা'র দীর্ঘ নিশ্বাস দিয়ে তৈরি।

সে তবে এখানে কেন এসেছিলো, যদি সে এসে তার স্বামীর দুঃখকে দিলো আরো গভীর করে', ঘোলা করে' তুললো তার স্মৃতির সমুদ্র! অনাদির জন্যে সত্যি-সত্যি তার মায়া করে, প্রতি-পদে মনে হয়, সে যেন তার যোগ্য নয়, পারছে না স্বামীর এই

ঔদাস্যের মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যেতে, তার বিরহের শুভ্রতায় নিয়ে আসতে বিস্মৃতির অন্ধকার। সে যেন এসেছে একটা কঙ্কাল, চপলার একটা মাত্র কায়িক অনুকল্প। গল্পের সেই নাকের বদলে সে যেন শুধু একটা নরুন।

নিজের উপর তার অমানুষিক ধিক্কার আসে। সে নিজেকে একান্তে নিয়ে যেতে পারে না তার স্বামীর কাছে—তার উদয়ের পিছনটা ভয়াবহ অন্ধকার, তাদের দু'য়ের মাঝখানে সেই মৃত অতীত রয়েছে স্তূপীভূত হ'য়ে। হাত বাড়িয়ে ছেলের পায় না নাগাল, সে কিনা এতো দুর্ব্বল—কে তাকে অনায়াসে দুই হাতে সবলে ঠেলে রেখেছে। তার সমস্ত শয্যায় ছড়িয়ে আছে কা'র মৃত্যুর কঠিন শীতলতা, শিশুর কণ্ঠে ফুঁপিয়ে উঠছে কা'র তিক্ত, তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ। তরলা চোখ মেলে ঘরে-বাইরের এই রুক্ষ শূন্যতা আর সহ্য করতে পারে না। জ্বালায় সে দিন-দিন শুকিয়ে যেতে থাকে।

কিন্তু বলো, তার কী দোষ!

এদিকে, ভাবো, অনাদির কী অন্যায় ভুল, থেকে-থেকে কাজের অন্যমনস্কতার মধ্যে ডাক দিয়ে ওঠে : চপলা!

ধরো, অন্ধকারে তরলা হয়তো বারান্দা দিয়ে এ-ঘর থেকে রান্নাঘরে যাচ্ছে, পৃথিবীতে কোথাও যেন কিছু হয় নি এমনি মুখ করে' অনাদি তাড়াতাড়ি বল্‌লে,—তাসের আড্ডায় আমার আজ

একটু দেরি হ'তে পারে, চপলা, আমার জন্যে বসে' থেকো না যেন।

নামটা উচ্চারণ করে'ই লজ্জায় অনাদি কণ্টকিত হ'য়ে ওঠে, কিন্তু শব্দের আঘাতে শূন্যে যে ক'টি সূক্ষ্ম রেখা ফুটে ওঠে, তা ঠিক চপলারই ত্বরান্বিত চঞ্চল গতির কয়েকটা শীর্ণ দীপ্তি। সেই ক'টি রেখার পাখায় ভর দিয়ে এই যেন চপলা এ-ঘর থেকে রান্না-ঘরে চলে' গেলো।

তরলা হয়তো, ধরো আরেকদিন, সন্ধ্যাবাতি দিয়ে লক্ষ্মীর পটের কাছে প্রণামে নুয়ে পড়েছে, তা'র ঐ সুকোমল বঙ্কিমায় কা'র একটি নাম যেন নিঃশব্দে রেখায়িত হ'য়ে ওঠে।

মুখ দিয়ে অলক্ষ্যে তা'র বেরিয়ে এলো: হ্যাঁ, স্পষ্ট বাঙলা করে' লক্ষ্মীর কাছে বর চাও চপলা, যেন এই রিডাকৃশানে চাকরিটা না খোয়া যায়।

প্রণাম সেরে তরলা উঠে দাঁড়াতেই, অনাদি গভীর অনু-শোচনায় আপাদমস্তক বিমর্ষ হ'য়ে উঠলো। ছি ছি, তার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে নাকি? মাত্র একটা নাম সে সুস্থ মনে উচ্চারণ করতে পারবে না?

মাথা তার খারাপই হয়েছে বলতে হ'বে। কিছুর মধ্যে কিছু না, দিব্যি সে বিকেলে আপিস করে' বাড়ি ফিরলো, বারান্দায় বসে' তরলা লণ্ঠনে তেল ভরছে, মাথার ঘোমটাটা কাঁধের উপর

খসা', দুই হাত নোংরা বলে' সচকিত হ'য়ে ঘোমটাটা তুলে দিতে পারছে না—এই তো একটা প্রাত্যহিকতার ছবি, অনাদির মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এলো : চপলা, এই টাকা ক'টা রাখো দিকি।

এবারের ডাকটা ভীষণ অনাবৃত, অনাদি একেবারে তরলার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

—কী বললে ? তরলা ফোঁস করে' উঠলো।

—বললাম যে মাসের আজ পয়লা, মাইনে পেয়েছি, টাকা ক'টা বাক্সে তুলে রাখো। পীড়িত মুখে অনাদি কোনো প্রসন্নতার আভা আনতে পারলো না।

—কিন্তু কী নাম ধরে' ডাকলে আমাকে ?

—বা রে, তোমার যে নাম তাই বলে' ডাকলাম ! সমস্ত মুখে অনাদি স্বচ্ছ একটা সরলতার ভাণ করলে।

—আমার কী নাম ? তরলা রুখে দাঁড়ালো।

—এমন প্রশ্ন তো কোনোদিন শুনিনি। অনাদির মুখে হাসির বদলে হাসির পরিশ্রমটাই ফুটে উঠলো : তোমার কী নাম তা তুমিই ভালো বলতে পারো। নাও, এখন টাকা ক'টা রাখো। অনাদি হাত বাড়িয়ে তরলার উড়ন্ত আঁচলটা মুঠো করে' চেপে ধরলে।

—যাকে দিচ্ছিলে তাকে দাও গে যাও। জাল-ছেঁড়া মাছের মতো তরলা একটা ঘাই মারলে।

—কাকে আবার দিচ্ছিলাম? অনাদি আকাশ থেকে পড়বার চেষ্টা করলো: এ-ঘরে তুমি ছাড়া আর লোক কোথায়?

—ঘরে থাকতে যাবে কেন? তরলার গলা হঠাৎ চোখের জলে ঘোলাটে হয়ে উঠলো: সে আছে তোমার মনের মধ্যে।

কাউকে যেন সে কস্মিন্‌কালেও চেনে না এমনি একটা সাদা, শূন্য দৃষ্টিতে অনাদি ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগলো: এমন লোক আবার তুমি কোথায় দেখলে?

—তোমার চপলা গো চপলা। ঘৃণায় তরলার চোয়াল দু'টো বিশীর্ণ হ'য়ে উঠলো: অন্ধকারে ঘরে ঢুকেই যাকে তুমি প্রথম সম্ভাষণ করলে।

তরলার মুখশ্রী তখন এমন কিছু অপরূপ হ'য়ে ওঠেনি, আর তা'র মানুষের গলায় এতো যে বিষ ছিলো তা-ও অনাদির জানতে বাকি ছিলো এতদিন। কিন্তু সেই অনুপাতে তার কঠিন হবার উপায় নেই, বরং তরলাকে নিজের কাছে ঘন করে' আনবার চেষ্টা করতে-করতে বললে,—কি শুনতে কী যে তুমি শোন, তার ঠিক নেই। ত, র, আর লা—কী হয়? এমন নাম আর কা'র আছে?

—যাক, আমাকে তুমি ছেলেমানুষ পাওনি। অভিমানে তরলার চিবুকটা নিটোল হ'য়ে উঠলো।

—ছেলেমানুষ, একেবারে ছেলেমানুষ। অনাদি তরলার

মুখ, দিনের আকাশে ওঠা ধূসর চাঁদের মতো বিষণ্ণ সেই মুখ, দুই হাতে তুলে ধরলো: নইলে সামান্য একটা কী নাম শুনতে ভুল করে' এমন গাল ফুলোও? চপলা—কে চপলা? যদি সে চপলাই হ'য়ে থাকে, চপলার মতো কবে আবার সে মিলিয়ে গেছে। তুমি সেই অন্ধকারে তরল, বিগলিত জ্যোৎস্নার মতো নেমে এসেছ। তুমি আমার কতো বেশি।

—ছাই, তরলা কিছুতেই তার মুখ উন্মীলিত করে' ধরলো না: সে নাম সব সময়ে তোমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে! অসহ্য স্নেহে অনাদি মুখ নামিয়ে আনলো: আর যে-নাম আমার মুখে বাসা বেঁধে আছে, তার বুঝি কোনো দাম নেই?

—যাও, আমি তোমার কেউ নই। তরলা শুকনো একটা পাতার মতো খসে' পড়লো: তবে কেন, কেন আমাকে বিয়ে করতে গেলে? এই অন্ধকারে বসে' সারাক্ষণ তা'র নাম জপ করে' জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতে না? সেই অন্ধকার ভালো করে' দেখাবার জন্যে কেন আমাকে দিয়ে তুমি বাতি জ্বালালে?

—তুমি কী বলছ যা-তা? অনাদি নিঃস্বের মতো চেহারা করে' দাঁড়িয়ে রইলো।

—আমাকে যদি ভালোবাসতেই না পারবে, তরলার দুই চোখ জলে ভরে' উঠলো: তবে আমাকে তুমি কেন বিয়ে করতে গেলে?

—তোমাকে ভালোবাসি না? অনাদি এতোক্ষণে যেন বলবার কতোগুলি কথা খুঁজে পেলো, ডান হাতটা তরলার দিকে প্রসারিত করে' বললে,—আমার গা ছুঁয়ে বলো তো কেমন তোমাকে ভালোবাসি না আমি? তোমাকে কতো সব গয়না গড়িয়ে দিলাম, যা যখন চাও, সব তোমাকে কিনে এনে দিচ্ছি, এখানে পাওয়া যায় না, নিয়ে আসছি কলকাতা থেকে, তবু বলো কি না, তোমাকে আমি ভালোবাসি না? চপলার জন্যে কী ছিলো? শুধু একটা কাচের আলমারি, তা-ও দেয়ালে লাগানো,—আর তোমার জন্যে এনে দিয়েছি একটা ড্রেসিং টেবল্। বেচারি কোনোদিন একটা শিশির তেল মাখে নি, তোমার কতো রঙ-বেরঙের প্রসাধন। বুনো এই পাড়াগাঁয়ে তোমার পায়ে জুতো পর্য্যন্ত শোভা পাচ্ছে। তবু, তোমাকে ভালোবাসি না? একথা তুমি বলতে পারলে?

এইখানেও সেই চপলা, বেচারি সেই চপলার সঙ্গেই তুলনা দেয়া।

—ছাই! তরলার গলা পাথর হ'য়ে এসেছে: সেই আগুনের তলা থেকে আমার জন্যে এক মুঠো গরম ছাই নিয়ে এসেছ।

—মেয়েমানুষ কিনা! অনাদি এবার বিষিয়ে উঠলো: তা না হ'লে এমন কথা আর কে বলবে?

—হ্যাঁ মেয়েমানুষ বলে'ই তো বলছি। তরলা কান্নায়

হঠাৎ অনর্গল হ'য়ে উঠলো : মেয়েমানুষ বলে'ই তো তোমার এই ভালোবাসা কঠিন একটা অপমানের মতো লাগছে।

—অপমান!

—হ্যাঁ, যখন আমার দাম, আমার দাবি, কতোগুলি শুধু জিনিস দিয়ে ধার্য্য করা হচ্ছে। তুমি তো আমাকে ভালোবাসো না, ভালোবাসার একটা জিনিসকে ভালোবাসো। তরলা দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

অথচ নিজের কাছে এই ছিলো অনাদির জোর, সমস্ত সংসারের কাছে উচ্চণ্ড বিজ্ঞাপন যে তরলাকে সে একতিল দুঃখে রাখেনি। অগোচরে কেউ যেন কখনো তীক্ষ্ণ একটা ভ্রূকুটি করতে না পারে তরলা এখানে পর্য্যাপ্ত নয়। যখন যা সে চেয়েছে, এবং কখনো কখনো তা'র প্রার্থনার বাইরে, তার শক্তির অতিরিক্ত। সেদিন সে তা'র জন্যে, মনে আছে, প্রকাণ্ড একটা ছবি বাঁধিয়ে এনেছিলো—শান্তনু আর গঙ্গার ছবি। ঘরে তা'র একটা মেনকা ও বিশ্বামিত্র, ও দুর্ব্বাসা ও শকুন্তলার ছবি আছে, ওটা হ'লেই বাকি দেয়ালটা সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। কল্‌কাতার রাস্তায়-রাস্তায় কতো খোঁজাখুঁজি করে' রবিবর্ম্মার সেই ছবি সে সংগ্রহ করেছিলো—হায় শুধু এই তরলার জন্যে।

এখানে, ষ্টেশনে নামতে, গোড়াতেই অমৃতর সঙ্গে দেখা।

অমৃত বললে,—এ কী, উইক-এণ্ডে তুমি কল্‌কাতা গিয়েছিলে নাকি? কী মনে করে'?

—আর বলো কেন, অনাদি প্রফুল্লমুখে বললে,—এক দিস্তে ফর্দ্দ। সব তুমি নিজে গিয়ে নিয়ে এসো।

—এটা কী? অমৃত ছবিটার দিকে আঙুল দেখালো।

—মহিষীর নতুন করে' ঘর সাজাবার সাধ হয়েছে। আর কিছু চাই না, শান্তনু আর গঙ্গার ছবি চাই।

—তাই নিয়ে এলে? বলো কী, অনাদি?

—না এনে উপায় কী! ছেলেমানুষ একটা সখ করে' যখন চাইলো—

খুসি হ'য়ে অমৃত তা'র পিঠটা একবার ঠুকে দিলো: ভালো কথা। তা হ'লে বউর সঙ্গে প্রেমে পড়ে' গিয়েছ বলো।

অপার সারল্যে অনাদি প্রায় বোকার মতো মুখ করে' বললে,—তা'র সঙ্গে চুলোচুলি করবো বলে'ই তো তাকে বিয়ে করিনি। সে আমার জন্যে এতো করছে, আমি না-হয় তাকে দুটো ফরমাজ-মতো জিনিসই কিনে দিলাম।

—আরে, এক কথায় তাকেই তো বলে প্রেম।

অমৃত যেন তাকে ঠাট্টা করছে এমনি একটা কথা মনে হ'তে সে তা ঠেকাতে গেলো। বললে,—সামান্য একটা ছবি এনে দিয়েছি বলে' যদি মনে করো—

—আরে বোকা, তাই তো আমরা চেয়েছিলাম।

—কিন্তু, কী করা যাবে বলো, লজ্জা ও সাহসের মাঝামাঝি গলায় অনাদি কথা কইলো: একটা লোক যদি সব সময়ে তোমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকে, তাকে তুমি এক-আধ সময়ে খুসি না করে' পারোই না। শত হ'লেও একটা জীবন্ত মানুষ তো। সারাদিন ঘরের মধ্যে বন্ধ, ঘর সাজানো ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই সংসারে, সে যদি সখ করে' ছবি একটা চেয়েই থাকে, তবে তুমি তা হাতে ধরে' কোন মুখে বারণ করতে পারো শুনি?

অস্ফুট একটু হেসে অমৃত বললে,—একশোবার। তাই তো বলেছিলাম, পৃথিবী আবার চক্রাকারে ঘুরে আসে, অনাদি।

তবু কোথাও যেন এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা খোঁচা ছিলো। অনাদির কর্ত্তব্যবোধকে তা বলে' তা বিদ্ধ করতে পারবে না। সে নিজে না ভরে' উঠুক, তরলাকে সে রিক্ত, বঞ্চিত রাখতে পারবে না।

অথচ এতোতেও তরলার তৃপ্তি নেই। এই উত্তপ্ত আশ্রয়, উচ্ছ্বসিত স্বচ্ছলতা, দুর্নিবার নৈকট্য, তবু সে নিজেকে সুখী মনে করতে পারলো না, তা'র দুই চোখ বেয়ে অসীম একটি বেদনা গলে' পড়ছে।

কী বলে'ই বা তরলা নিজেকে সুখী মনে করতে পারে? সে সব পেয়েছে, স্বীকার করতে তা'র কুণ্ঠা নেই, স্বামীর আবিষ্ট

আবেষ্টন, স্বামীর উৎসারিত অজস্রতা—যদি বলতে চাও তাকে প্রেম, প্রেম; কিন্তু হায়, পায় নি সে স্বামীর সুখ, স্বামীর পরিতৃপ্ত পূর্ণতা।

আকাশে সূর্য্য যদি না জাগে তা'র উলঙ্গ উদারতায়, তবে জল কী করে' উত্তাল হ'য়ে উঠবে? তুমি যদি সুখী না হও, তবে আমি কিসে সুখী হ'লাম?

তরলা একান্তে, অন্ধকারে, তার অন্তরের নির্জ্জনতায় এসে বসলো।

তার জন্যে কতোগুলি জিনিসের স্তূপ, সাদা কতোগুলি হাড়ের সমষ্টি। বন্ধ্যা পাতাবাহারের রঙিন কতোগুলি পাতা। সে যেন এখানে এরি জন্যেই এসেছিলো? বাইরে চূণকাম-করা মৃত একটা কবরের মতো সে যেন কা'র সাথী হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অথচ অনাদির জন্যে এতোটুকু সে কোথাও কৃপণতা করে নি। কিন্তু পেলো না সে কখনো সমগ্র অনাদিকে। অনাদির অতীত, সেই প্রথম প্রতপ্ত যৌবন, তা'র জন্যে নয়, তা'র জন্যে নয় তা'র সেই দুর্ভেদ্য পবিত্রতা। বেহুলার মতো যেন সে একটা কঙ্কাল নিয়ে ভেসে চলেছে। বিশাল সেই ভোজের পরে যেন সে ভিখারিণীর মতো উচ্ছিষ্ট কুড়োচ্ছে। সামনে যতো সে অগ্রসর হচ্ছে মুহূর্ত্ত ঠেলে, ততোই যেন সে অপসৃত অতীত দীর্ঘ ছায়া মেলে তাকে অনুসরণ করছে। যতোই সে ভরে' তুলছে

তা'র পেয়ালা, চুমুক দেবার সময় কা'র মুখের প্রতিবিম্ব উঠছে ভেসে। এই জীবন নিয়ে সে কী করবে, এই জিনিসের জীবন?

সন্ধ্যের দিকে তরলা আলস্যে এলিয়ে আছে বিছানায়, নিঃশব্দ পায়ে অনাদি ঘরে ঢুকলো।

ঘরে বাতি জ্বালা হয় নি, নরম নতুন অন্ধকারে সমস্ত শূন্যতাটা স্বপ্নের মতো অবাস্তব মনে হচ্ছে, তার মাঝে তরলার এই অসাময়িক শুয়ে থাকাটুকু করুণ, নিরুচ্চার একটা কাকুতির মতো মনে হ'লো। ঘরের অন্ধকার যেন অনাদির অতলস্পর্শ মায়ায় ঘন, গভীর হ'য়ে উঠলো। তরলার এই বিসর্পিত ভঙ্গিতে যেন উচ্চারিত হ'য়ে উঠেছে তা'র অসহায় রিক্ততা। অনাদি আ'র নিজেকে গোপন করতে পারলো না, পা টিপে-টিপে সে বিছানার কাছে এগিয়ে এলো।

কোমল একটি বেদনায় তরলাকে এখন কী সুন্দর লাগছে! তা'র কৃশতাটি বাঁশির একটা উদাস টানের মতো মিঠে। মিছি-মিছি এতোদিন মনে-মনে তাকে সে একটা জিনিসের পর্য্যায়ে রেখেছিলো, মাত্র একটা প্রাণধারণের প্রাথমিক প্রয়োজন, সত্যি কি তাই, কিন্তু আজ, এই তরল, এলোমেলো অন্ধকারে অনাদি তা'র স্নেহের আর কোনো কূল দেখতে পেলো না। অন্ধকারে, তা'র চোখের সামনে, সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ একসঙ্গে গেলো নিশ্চিহ্ন হ'য়ে।

হ্যাঁ, মৃত্যু যদি সবই মুছে দিতে পারলো, নিঃশেষে সমস্ত দিতে পারলো শেষ করে', তবে এইটুকু মায়া আর বাকি থাকে কেন? তরলা আর তা'র কাছে সামগ্রী নয়, তা'র জীবনের সমগ্রতা। নয় সে একটা অভ্যাস, সে আকাশ থেকে ঝরে' পড়া আনন্দ। আরো কাছে এগিয়ে এগিয়ে এসে তরলার গায়ে মৃদু-মৃদু ঠেলা দিয়ে অনাদি ব্যাকুল গলায় বললে,—একী, শুয়ে আছো কেন? অসুখ করেছে নাকি কিছু?

স্বামীর ডাকে অসীম মমতা যেন উথলে উঠলো। যে-হাত-খানি অনাদি তা'র কপালের উপর এনে রেখেছে তা যেন কতো মৃতদিনের শীতলতা দিয়ে তৈরি।

অনাদি অজস্র, অনর্গল হাতে তরলাকে আদর করতে লাগলো, তা'র কপালে বুলোতে লাগলো হাত, চুলের জটিল রুক্ষতা দিতে লাগলো ছাড়িয়ে, মুয়ে পড়ে' তা'র চোখের পাতার উপর চোখ রেখে বারে-বারে তাকে জেগে উঠতে বললে,—কিন্তু তরলার শরীরের একটি রেখায়ো কোথাও প্রতিধ্বনি নেই, স্পর্শে নেই উত্তাপ, চোখে নেই দীপ্তি, ভঙ্গিতে নেই তীক্ষ্ণতা। তরলা নিস্তরঙ্গ, নির্ব্বাপিত শুধু একটা অস্তিত্বের বোঝা হ'য়ে পড়ে' আছে।

কী করে'ই বা সে সাড়া দিয়ে উঠবে বলো? দুই উৎসারিত হাতে অনাদি শুধু এখন চপলাকে আদর করছে, চিরকাল যা'র

জন্যে তা'র দুই হাতে ছিলো অবারণ অজস্রতা, তার মাঝে চপলাকেই বলছে জাগতে, যাকে জাগাবার জন্যে সে তা'র দুই চোখে নিয়ে এসেছে এতো আলো, এতো পিপাসা! এর মাঝে তা'র কোনো মৌলিকতা নেই, শুধু ধারাবাহিক, বহু-অনুকৃত একটা অভ্যাস। একটা যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি।

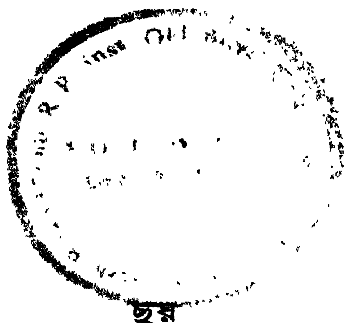
—ওঠো, অনাদি তাকে জোর করে' কাছে টেনে আনবার চেষ্টা করলে: অসময়ে এমনধারা বিছানা নিলে কেন?

বিষাদে বিশাল দু'টি চোখ তুলে' তরলা স্বামীর মুখের দিকে তাকালো।

কিন্তু, এ কী আশ্চর্য্য, ভয়ে ও বিস্ময়ে অনাদি একেবারে নিষ্প্রভ হ'য়ে গেলো, তরলার নিশ্চয়ই কোনো অসুখ করেছে, তা'র চোখে যেন চপলারই সেই বিশীর্ণ পাণ্ডুরতা। সেই ধূসর ব্যর্থতার আভা, সেই কাতর, পরিশ্রান্ত একটা ভয়।

নিমেষে অনাদির সমস্ত স্পর্শ যেন শিথিল হ'য়ে এলো। ঠাণ্ডা লিক্‌লিকে একটা সাপের মতো সেই চপলার স্মৃতি যেন তাকে হঠাৎ বেষ্টন করে' ধরেছে।

—দাঁড়াও, আমি আসছি, তরলাকে তাড়াতাড়ি বালিসের উপর নামিয়ে দিয়ে অনাদি উঠে দাঁড়ালো: আমার পার্স টা বোধ হয় বাইরের ঘরে টেবিলের ওপর ফেলে এসেছি। সদরটা আবার খোলা। অনাদি দ্রুত পায়ে পলায়ন করলে।



ছয়

সমস্ত সংসার থেকে তার নাম যেন অনাদি নিঃশেষে হারাতে দিতে পারবে না। কথায় ও স্তব্ধতায় তা যেন অহর্নিশ উঠছে অনুরণিত হ'য়ে। তা হোক, কিন্তু এ কী কাণ্ড!

তরলা এ আর কিছুতেই সহ্য করতে পারলো না। মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে' এতোদিনে সে অনাবৃত কণ্ঠে চীৎকার করে' উঠলো।

আজ সমস্ত দুপুর সে খুঁটিনাটি করে' ঘর গুছিয়েছে। প্রেম তা'র কাছে অমানুষিক একটা বিলাসিতা, প্রায় দুরারোহ পর্ব্বত-চূড়ার মতো, প্রেম সে চায়ও না বলতে গেলে। তা'র জন্যে থাক এই প্রাত্যহিক প্রয়োজনের পৃথিবী, অনুদ্ঘাতিনী সমতলতা— তা'র থেকে এক ইঞ্চি তাকে টলায় কারো সাধ্যি নেই। সমস্ত সংসার সে তা'র করতলের উপর নিয়ে আসবে, সমস্ত কলা-কৌশল তা'র নখদর্পণে। সূচ্যগ্র জায়গা সে কখনো ছাড়বে না।

সেই ভেবেই আজ থেকে হঠাৎ আবার সে তা'র প্রভুত্ববিস্তার করেছিলো। মলিন দিনের পর তারাঙ্কিত প্রদীপ্ত রাত্রির মতো তরলার এই নবতর আবির্ভাবে অনাদির মনে সকাল থেকে খুসি আজ আর ধরে নি। কিন্তু আকস্মিক এ কী বিস্ময়কর! আপিস থেকে ফিরে আসতে আসতেই এ কী প্রবল সম্বর্দ্ধনা!

ঘর গুছোতে-গুছোতে আলমারির মাথার উপরে তরলা কি-একটা হঠাৎ রোমাঞ্চকর আবিষ্কার করলে। বিশেষ কিছুই নয়, ফ্রেমে-আঁটা চৌকো একটা ফটো—আষ্টেপৃষ্টে তা'র একটা মোটা তোয়ালে দিয়ে বাঁধা।

ক্ষিপ্রহাতে সে-বাঁধনটা তরলা এক নিশ্বাসে খুলে ফেললো। যা সে ভেবেছিলো, তারই সমবয়সী একটি মেয়ের ছবি, কে এই মেয়ে তা আর তরলাকে খুলে বলে' দিতে হ'বে না, তা'রো মতো কপালে তার সিঁদুরের টিপটা জ্বলজ্বল করছে—বাঁধনটা খুলে দিতেই মেয়েটি কেমন তার মুখের দিকে চেয়ে এক ঝলক হেসে উঠলো, পরিচিত প্রসন্ন হাসি। তরলার কেমন অশরীরী একটা ভয় করে' উঠলো সেই হাসি দেখে।

কিন্তু যতো ভয়ই সে পাক, অনাদির মতো কখনো নির্লজ্জ ভয় পাবে না। মড়ার মতো রাখবে না তাকে সে আর তোয়ালে দিয়ে বেঁধে, আলমারির আড়ালে, তাকে সে একটা বিশিষ্ট জায়গা দেবে, একেবারে উন্মুক্ত উজ্জ্বলতায়।

নেপথ্য

ফটোটা তরলা একেবারে তাদের শোবার ঘরের দেয়ালে এনে টাঙালে। টুলে করে' দাঁড়িয়ে নিজের হাতেই পেরেক পুঁতলে, আঙটাতে নিজেই বাঁধলে দড়ি, আঁচলে করে' কাচের থেকে ধূলোর পর্দ্দাটা মুছে নিয়ে নিজেই ঝুলিয়ে দিলে।

আপিস থেকে ফিরলে অনাদিকে সে একটা শুধু ফুলের মালা কিনে এনে দিতে বলবে।

কিন্তু কোথা থেকে যে কী হ'য়ে গেলো, বারান্দায় অনাদির পায়ের শব্দ হ'তেই তরলা হঠাৎ গলা ছাড়লে। তা'র এতোটুকু সেই শরীরের পাত্রে শোকের এতো বড়ো একটা সমুদ্র যে কী করে' ধরলো অনাদি সেই মুহূর্ত্তে কিছু আয়ত্ত করতে পারলো না।

অনাদি ঘরের মধ্যে ছুটে এলো, ব্যাকুলতায় ভাঙা গলায় জিগ্‌গেস করলে : কি, কী হ'লো তোমার? সাপ?

তরলা এতো কান্নার মধ্যেও অদৃশ্যে বোধকরি একটু হাসলো। দেয়ালের দিকে আঙুল তুলে বললে,—কী ওটা?

ঘাড়ে ধরে' অনাদির মুখটা যেন কে দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে দিলে। সে-ও কেমন, বললে ভুল হবে না, নিস্তেজ অবশ হ'য়ে পড়লো।

শুকনো গলায় অনাদি একটা ঢোঁক গিললো : হ্যাঁ, ওটা, ওটা তুমি কোথায় পেলে?

—যত্ন করে' তোয়ালে দিয়ে যে মুড়ে রেখে দিয়েছিলে, কিন্তু

লজ্জা কী, তরলা বিযে একেবারে জর্জ্জর হ'য়ে উঠলো : দেয়ালে একেবারে লম্বা করে' টাঙিয়ে রাখলেই হয় !

—তুমিই টাঙিয়ে রেখেছ নাকি ? অনাদির মুখে স্বচ্ছ একটা আভা দিলো।

—খুসিতে একেবারে দেখছি ডগোমগো করে' উঠেছ ! তরলা তাকে কথা দিয়ে একটা ধাক্কা দিলো : যাও না, পয়সা খরচ করে' একটা মালা নিয়ে এসো না। গান্ধর্ব্ব মতে তোমাদের আবার বিয়ে হোক, আমি দেখি।

—একেকসময়ে কী যে তুমি বলো, তরলা ! আবহাওয়াটাকে অনাদি পাৎলা করে' দিতে চাইলো। তরলা যখন নিজে থেকেই ছবিটা টাঙিয়েছে, তখন আর ভয় নেই, এমনি একটা সহজ ধারণা করে' অনাদি হালকা একটি হাসির টান দিয়ে বল্‌লে,—তবু যা হোক এতোদিনে একটা উদারতার পরিচয় দিলে। ঠিকই তো, ওকে, সামান্য একটা ছবিকে লজ্জা করে' আমাদের লাভ কী !

—ও ! লজ্জাটা তোমার ছবির কাছে ! তরলা লক্‌লক্ করে' উঠলো : রাখো, ও-ছবি আমি রাখছি ওখানে টাঙিয়ে।

—কেন, কী হ'লো ?

তরলা আবার একটা কান্নার ঢেউ তুললে :

—তাতে কী হয়েছে ? অনাদির গলা কাগজের মতো সাদা হ'য়ে এলো : একটা শুধু মরা মানুষের ছবি।

—বেশ তো, সেই ছবিটাই আজ তোমার বিছানায় শুইয়ে দেবো। কান্নার প্রাবল্যে তরলা নিজেই গিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিলে।

অনাদি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো : আমি তো কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। সামান্য একটা ছবির ওপর তোমার এতো রাগ কেন ?

কান্নায় প্রখর গলায় তরলা ঝাঁজিয়ে উঠলো : ছবি নিয়েই যদি থাকবে, তবে ঠাট করে' আমাকে বিয়ে করতে গিয়েছিলে কেন ?

অনাদি তার মুখের কাছে মমতায় নুয়ে এলো, কপালের থেকে গুঁড়ো-গুঁড়ো চুলগুলি সরিয়ে দিতে-দিতে বললে,—তাতে কী হয়েছে ? ও তো সম্পর্কে তোমার দিদি।

স্বামীকে ঠেলে দিয়ে তরলা দুই হাতে মুখ ঢেকে বলে' উঠলো : শত্রু, শত্রু, ও আমার শত্রু।

—শত্রু ? তুমি এ বলছ কী তরলা ?

—সাত জন্মের শত্রু। ওর দিকে তাকালেই ভয়ে আমার গা-হাত-পা কাঁটা দিয়ে ওঠে। তরলা কান্নায় গলে' পড়তে লাগলো : ওর দিকে যতো তাকাবো না ভাবি ততোই আরো বেশি করে' তাকাতে হয়। ও আমার দিকে সব সময়ে চোখ কটমট করে' চেয়ে আছে। কী যেন আমাকে ও শাসাচ্ছে সব সময় !

অনাদি জোরে হেসে উঠলো। তরলাকে কোলের কাছে টেনে এনে বললে,—পাগল! ও খুব ভালো মেয়ে ছিলো। যেমন নম্র, তেমনি নিরীহ। তুমি তো আর ওকে দেখ নি, তুমি তো জানো না, ওর মতো—কথাটা অনাদি শেষ করতে পারলো না। জানলার বাইরে রাত্রির অন্ধকারে সে যেন চপলার সেই দুটি বিশাল চক্ষুর উদ্ভাসিত দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছে।

কোল থেকে সবেগে সরে' যাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে-করতে তরলা বললে,—তবে সেই ভালো মেয়েকেই চিরকাল কোলে নিয়ে থাকলে পারতে। আমাকে তবে এখানে ডেকে আনবার জন্যে তোমাকে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিলো?

অনাদি উদাস গলায় বললে,—নইলে আমি থাকতুম কী করে'?

—কেন, ঐ ছবি নিয়ে?

তাকে দুই বাহুতে নির্জ্জীব করে' রেখে অনাদি গাঢ় গলায় বললে,—ও তো একটা ছায়া, কিন্তু তুমি, তুমি আমার কতো কাছে।

ঘরের মধ্যে পাতা-ঝরানো শীতের খানিকটা শুকনো হাওয়া হা-হা করে' উঠলো।

তরলা কিছুতেই তবু নিজেকে ধরা দিলো না, বললে,—আমি কাছে হ'লে কী হ'বে, কিন্তু তুমি তো আমার কাছে নেই?

—কাছে নেই ? অনাদি স্নেহে ঘনতরো হ'য়ে এলো : তুমি কী যে বলো, তরলা ! চোখ মেলে তুমি এটুকুও দেখতে পাবে না ?

—এমনিতে দেয়ালটাও তো আমার কাছে ছিলো। দ্রুত একটা ভঙ্গি করে' তরলা উঠে বসলো : চোখ মেলে সবই তো মানুষে দেখতে পারে।

—কী দেখতে পারে ?

—যা দেখবার। দূরে দেয়ালের দিকে তরলা ভীত, মূঢ় দুটি চোখ তুললো : ঐ ফটো।

অনাদি আবার তাকে, তার এই রূঢ় ভঙ্গিটাকে নম্রতায় নামিয়ে নিয়ে এলো : মানুষে পারে না, কিছুই দেখতে পারে না তরলা,—তার এই ক্ষুধা, এই শূন্যতা, এই অসীম ভালোবাসা।

কুণ্ডলীকৃত সাপের মতো তরলা কিলবিল করে' উঠলো : অকৃতজ্ঞ কোথাকার !

অনাদি সমস্ত শরীরে ঠাণ্ডা, পাথর হ'য়ে গেলো।

—এতোই যখন তাকে ভালোবাসো, তার জন্যে এতোই যখন মন তোমার পোড়ো বাড়ির মতো খাঁ-খাঁ করছে, তরলা আবার একটা কান্নার ঝাপটা হানলে : তখন আমাকে এই শ্মশানে তুমি ডেকে নিয়ে এলে কেন ?

—প্রাণের উৎসবে এই শ্মশান তুমি আবার শ্যামল করে'

দেবে বলে'। মরুভূমিতে নিয়ে আসবে শীতল জলধারা। অনাদি ভাবে প্রায় বিভোর হ'য়ে উঠলো : তাই তো বলছিলাম লোকে কিছুই বুঝতে পারে না, তরলা, কী অমৃতের পিপাসা আমাদের রক্তে! কী ক্ষুধা নিয়ে আমরা ঘুরে বেড়াই! কতো আমরা ভালোবাসতে পারি। কতো প্রয়োজন আমাদের ভালোবাসার।

—ছাই!

—পুরুষের সে-শক্তি সে কল্পনা সে-মহত্ত্ব তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না, তরলা। অনাদি দার্শনিকের মতো উদাস মুখ করলে: আমাদের স্নেহের সে সমুদ্র থেকে এক অঞ্জলি জল কেউ তুলে নিলে আমরা মরুভূমি হ'য়ে যাই না। তখনই মরুভূমি মনে হয় যদি আর কেউ এসে সে-জলে না স্নান করে।

—স্নান করতে গিয়ে তো গায়ে কেবল কাদা মাখছি। তরলার গলা বেদনায় ধূসর হ'য়ে এলো।

—মিথ্যে কথা! অনাদিও দেখাদেখি ম্লান মুখে বললে,—অকৃতজ্ঞ তা হ'লে তোমাকেই বলতে হয়।

—তা হ'লে তুমি আমাকে ভালোবাসো বলতে চাও?

—কিছুই বলতে চাই না, কেননা বলে' কিছুই বোঝানো যাবে না, তরলা, তুমি শুধু একবার আমার চোখের দিকে চেয়ে দেখ।

স্পর্শের প্রশ্রয়ে ভঙ্গিটা এবার তরলাকে শিথিল করে' আনতে হ'লো। স্পষ্ট একটু বা রূঢ় গলায় বললে,—তবে আমার গা ছুঁয়ে বলো, দিব্যি গেলে বলো, ঐ ফটোটার চেয়ে আমাকে তুমি বেশি ভালোবাসো।

অলক্ষ্যে অনাদি বুঝি একবার দেয়ালের দিকে চোখ ফেরালো। অন্ধকারে হঠাৎ সমস্ত দেয়ালটা কেমন শূন্য হ'য়ে গেছে।

কিন্তু তরলার চোখ উঠেছে ক্ষুধিত, ক্ষুরের মতো ধারালো হ'য়ে : মিথ্যে বোলো না যেন মিথ্যে যদি বলো, তবে আমিও কিন্তু অমনি একদিন চ'লে যাবো বলে' রাখছি।

অনাদি তরলার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গদগদ হ'য়ে বললে,—এ-কথা আবার জিগ্‌গেস করতে হয়। তুমি এতোতেও বুঝতে পারছ না? কিসের সঙ্গে কিসে?

তরলা তা'র গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বললে,—বলো, থামলে কেন?

অনাদি একটা ঢোঁক গিললো কি-না বোঝা গেলো না; ধূসর, নিষ্প্রাণ গলায় বললে,—কিসের সঙ্গে কিসে! একটা জ্বলজ্যান্ত সত্যের কাছে শুধু একটা ছায়া! স্থূল একটা উপস্থিতির কাছে গত রাত্রের একটা স্বপ্ন! তরলার খোলা চুলের মধ্যে মুখ ঢেকে অনাদি হঠাৎ শিশুর মতো অবুঝ গলায় বললে,—যে-লোক মরে' যায়, তরলা তা'কে আমরা কক্‌খনো ভালোবাসি না।

নেপথ্য

হঠাৎ, কাউকে বিন্দুমাত্র প্রস্তুত হবার সময় না দিয়ে, ঘরের সেই পুঞ্জীভূত শূন্যতা ভেঙে কা'র বজ্র-বিদারণ হাসি অন্ধকারে খান-খান হ'য়ে পড়লো। বেজে উঠলো কা'র দ্রুত করতালি, নিষ্ঠুর তীক্ষ্ণ একটা বিদ্রূপের হাহাকার। কে যেন এতোক্ষণ এখানে আড়ি পেতে ছিলো, অনাদির মুখের কথাটা শেষ হ'তেই, এখান থেকে সে ছুটে পালিয়েছে, ঝড়ের মতো, ধুলো উড়িয়ে, সমস্ত আকাশ অন্ধ করে', উন্মাদ, দিশেহারা। এতোদিন যেন সে তবু দুয়ারে বসে' প্রতীক্ষা করেছিলো, আর তার আশা নেই, নেই আর তার কোনো আশ্রয়। তাই আবার কে যেন একটা উপবাসী অট্টহাস্য করে' গেলো—তার শেষ সম্ভাষণ!

শব্দের অসহ্য প্রচণ্ডতায় অনাদি উঠলো ধড়মড় করে' : কী, কী হ'লো?

আর বিবর্ণ, স্তম্ভিত তরলা ভয়ে-ভয়ে স্বামীর একখানা হাত ধরলো : আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

এতো অন্ধকার কোথায় যে এতোদিন সঞ্চিত হ'য়ে ছিলো অনাদিকে তা কে বলবে? পকেট হাতড়ে দেশালাই বার করে' তাড়াতাড়ি সে আলো জ্বালালো। কই, কে, কোথায়!

ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়, তরলা বললে।

পেরেক আলগা হ'য়ে সদ্য-টাঙানো বিশালায়তন সেই

নেপথ্য

ফটোটা মেঝের উপর ভেঙে পড়েছে। মেঝে-ময় গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে ছিটিয়ে পড়েছে কাচের কুচি, ফটোটা ধূলোয় রয়েছে মুখ থুবড়ে।

কাচের টুকরোগুলি যেন কা'র হাহাকারের টুকরো, অনাদি শুনলে।

সাত

যে-লোক মরে' যায়, তাকে আমরা ককৃখনো ভালোবাসি না।

তরলা বিশ্বাসের সাহসে একেবারে উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠলো। এতোদিন মিছিমিছি সে করুণার ভিখারি হ'য়ে ছিলো, এখন সে বিস্তার করলো তা'র অধিকার, উড়ন্ত পাখির প্রসারিত পাখার মতো। তা'র স্বামী, তা'র ঘর, এমন কি ছেলে পর্য্যন্ত তা'র। তা'র একার মালিকানা। তরলাকে আর কেউ ঠেকাতে পারলো না।

বলা বাহুল্য সেই ফটো আর বাঁধানো হ'লো না, তক্তপোষের তলায় সঞ্চিত আবর্জ্জনার মধ্যে লজ্জায় মুখ লুকিয়ে পড়ে' রইলো। দেয়ালের আলমারির মধ্যে যতো উপকরণ থরে-থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছিলো, সব সে দিলো ছত্রখান করে'। পচা, পুরোনো মতো ফ্যাসানের কঙ্কাল, তরলার সময় অনেক এসেছে এগিয়ে।

হাতের বাজুতে কে কবে একটা কী মাদুলি বেঁধেছিলো, সেটা পর্য্যন্ত রয়েছে। মাদুলি প'রেই ছেলে পেয়েছিলো বুঝি। এমন একটা চিরুনির কন্যে কতোদিন থেকে তরলা ভাবছিলো, ঘরে থাকতে কেন সে ফের কিনতে যাবে? হ্যাঁ, কিনতেই হ'বে ঠিক, তরলার আঙুল ক'টা একসঙ্গে ছি-ছি করে উঠলো, চিরুনির দাঁড়ায় আটকে আছে কা'র শুকনো ক'টা চুলের গুছি! জানালার বাইরে ডোবার জলে চিরুনিটা সে ছুঁড়ে ফেললে। আর এটাই বা রয়েছে কেন, এই কয়েক-দাগ-খাওয়া ওষুধের শিশিটা, পচা লাল খানিকটা জল! এটা দিয়ে কা'র মুখে জল দেয়া হচ্ছিল শুনি? শিশিটা বোতলওলার কাছে বেচবার কথাটাও একবার তরলা ভাবতে পারলো না।

দেখতে দেখতে দু'দিনের মধ্যে তরলা এমন বদ্‌লে গেলো যে ঘুমের চোখে ভুল করে'ও তাকে আর চপলা বলে' ডাকবার জো নেই।

নিশ্চয়। কোথায় স্বামীকে সে আনন্দ-উৎসাহে উজ্জ্বল করে' রাখবে, তা না, নিজেই সে তা"র অকারণ বিষাদের ছোঁয়াচে দিনে দিনে জুড়িয়ে আনছিলো। আর সে এই নিঃস্বতার ভার রাখবে না তা'র শরীরে, তা'র সংসারের চারধারে। ছটায় ও ছন্দে সমস্ত আকাশে সে বিকীর্ণ হ'য়ে পড়লো।

অনাদির দুই চোখ আলোর অসহ্য তীব্রতায় অন্ধ হ'য়ে

গেলো। এতো অনাবরণ যেন সহ্য করা যায় না, এতো প্রখরতা। দিনের রৌদ্রে ঘুমের সমস্ত কোমলতা গেছে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে। দেয়ালের কোণে-কোণে পানের সেই দাগগুলি পর্য্যন্ত নেই। সেই লাল সাড়িটা দেখা গেলো খণ্ড-খণ্ড হ'য়ে ঘর মোছবার ন্যাকড়া হয়েছে, ভুলোর সেই খরগোসটার বদলে দেয়ালে এসেছে এখন রেশমের সুতোয় নীল পেখম-মেলা একটা ময়ূর। অনাদি আর একটা টুঁ শব্দ পর্য্যন্ত করতে পারে না—তা'র নিজে-রই আর কোনো মূল নেই। বরং সান্নিধ্যে আরো তাকে উত্তপ্ত হ'য়ে উঠতে হয়। তরলা খুঁজে পেয়েছে তা'র জায়গা, তা'র বিশাল ভবিষ্যতের ক্ষেত্র, তাকে আর এখন পায় কে, তাকে টলায় আর কা'র সাধ্যি? কিছু বলতে আসুক না একবার অনাদি, তরলা সমস্ত সংসার তছনছ, ওলোট-পালোট ক'রে দেবে।

কী বা তোমার আর বলবার থাকতে পারে! যে-লোক ম'রে যায় তাকে আমরা ককৃখনো ভালোবাসি না!

ঘরময় বিস্মৃতির শুভ্রতায় অনাদি এখন, কেন কে জানে, চপলার অশরীরী একটা উপস্থিতি অনুভব করে, পরিব্যাপ্ত একটা অনুভূতির মতো। তাকে যেন এখান থেকে কিছুতেই সম্পূর্ণ তাড়ানো যাবে না—তুমি তাকে তোমার বিছানা থেকে, তোমার ঘর থেকে, তোমার জীবন থেকে তাড়িয়ে দিতে পারো, কিন্তু সে দাঁড়িয়ে রয়েছে তোমার বাইরে, ছড়িয়ে পড়েছে বিশাল অন্ধকারে,

দুয়ারের চৌকাঠের উপর বসে' আছে অভিমানে মুখ ভার করে'। কখনো তা'র সেই তলোয়ারের মত উলঙ্গ একটা হাসি শব্দের তীক্ষ্ণতায় তার বুকের মধ্যে ঝলসে ওঠে। প্রতিবাদ করা বৃথা, যে লোক মরে' যায়, তাকে আমরা ককৃখনো ভালোবাসি না।

হ্যাঁ, তাকে তরলারই সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করতে হয়!

এতে কিন্তু কথাটার অপব্যবহার হচ্ছে না। জীবনের কোনটা নয় অভিনেয়? তুমি যখন তোমার অনুভূতিতে নির্ব্বাক, স্তব্ধ হ'য়ে বসে' থাকো, সে-ও তোমার প্রকাশেরই একটা অভিনয়। আর যখন তুমি মৃত্যুতে গেছ মুছে, সেও তোমার একটা বিস্মৃতির প্রতিচ্ছায়া!

ভালোবাসাতে অভিনয়ের অতিরিক্ত কিছু নেই। আগাগোড়া তা একটা সমমাত্রিক মীমাংসা, একটা শারীরিক সামঞ্জস্য।

তাই তরলাকেও অনাদির ভালোবাসতে হচ্ছে। কিছুমাত্র ত্রুটি না করে' কোথাও ছেদ না রেখে।

তবু থেকে-থেকে কেবল তা'র মনে হয় এর চেয়ে তা'র সেই ছন্নছাড়া জীবনের এলোমেলো ছন্দহীনতাও যেন ভালো ছিলো না। তা'র মাঝে পবিত্রতা ছিলো না, আনন্দ ছিলো না, আত্মার উৎসার ছিলো না। বলতে দুঃখ কি, এখানেও তো তা নেই। নেই সেই সতেজ পবিত্রতা, সেই রোমাঞ্চিত দীপ্তি, সেই আত্মার সৌগন্ধ্য। অমৃতর ভাষায়, এখানেও তো সেই প্রাণহীন অভ্যাসের ধারাবাহিকতা।

মাঝখান থেকে শুধু সে তা'র চপলাকেই ফিরিয়ে দিয়েছে।

এর আগে, সমস্ত রাতের মলিনতার পর চপলার স্মৃতি তা'র মনে সূর্য্যোদয়ের মতো নির্ম্মলতায় উজ্জ্বল ছিলো, এখন সমস্ত দিনের উৎসবের পব চপলার স্মৃতি তা'র মনে ঠাণ্ডা, ভয়ার্ত্ত অন্ধকারের মতো গুটি-গুটি নেমে আসে। কিন্তু উপায় নেই, ধনুকের থেকে তীর গিয়েছে ছুটে, কথা সে এখন আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না। তা'রই স্বাদে তরলা এখন একেবারে একটা বাঘিনীর মতো প্রদীপ্ত হিংস্রতায় ঝলমল করে উঠছে।

হ্যাঁ, এমন কি ছেলে পর্য্যন্ত তা'র।

—দেখ, তরলা একদিন কঠিন গলায় একটা হুম্‌কি ছাড়লো ওর নাম আমি বদলে রাখবো।

—কী? অন্যান্য ছেলেমানুষি আবদারের বেলায় যেমন, অনাদি এখন হাসতে পারলো না।

—নবকুমার। বেশ নাম, নয়? তরলা গম্ভীর মুখে বললে, বঙ্কিমবাবুর দেয়া নাম। তুমি অমনি ফেলতে পারবে না।

—হ্যাঁ, ভালোই তো। অনাদি আপত্তি করবার কিছু দেখতে পেলো না: ঐ ওর ভালো নাম থাকবে।

—শুধু ভালো নাম নয়। ডাকতেও হ'বে ওকে নবকুমার বলে'।

অনাদির মুখ শুকিয়ে গেলো: কেন, জানোয়ার কী হ'লো?

—ও আবার একটা নাম? তরলা বিদ্যুতের মতো দ্রুত একটা ঝিলিক দিয়ে উঠলো : কোনো ভদ্রলোকের ছেলের অমন নাম থাকে? ভূভারতে তুমি কোথাও শুনেছ মানুষকে কেউ কখনো জানোয়ার বলে?

অনাদি হাসবার একটা অকায়িক চেষ্টা করলো : সেইটাই তো ওর বিশেষত্ব। কে জানে হয়তো এই নামেই ও একদিন স্বনাম-ধন্য হ'য়ে উঠবে।

—আগাগোড়া বাপের মতো একটি সুগোল বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে! তরলা ভুবন-ভুলানো একটা ভ্রূকুটি করলো : আর নামটা নবকুমার হ'লেই ও আর কোনোদিন ইস্কুলে প্রমোশন পাবে না, না?

—বেশ তো, ঐটেই ওর পোষাকি নাম থাক, ইস্কুলের খাতায়, গেজেটের পৃষ্ঠায়, জনতার পতাকার ওপরে। অনাদি যেন অপরাধীর মতো বললে,—কিন্তু তোমার-আমার কাছে ও সামান্য একটা জানোয়ার।

—না, তোমাকে নবকুমার ব'লেই ডাকতে হ'বে।

—বড্ড যে বড়ো নাম। অনাদি ম্লান হ'য়ে গেলো : পাঁচ অক্ষর। বলতে যে কেবল বাধবে।

—শুধু কুমার বললেই চুকে যাবে, তরলা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালো : নইলে কাজ নেই, অকাজ নেই, কী কেবল একটা অশিক্ষিত, অভদ্র নাম ধরে' ডাকা।

কিন্তু যাই বলো, যতোই কেননা তড়পাও, আন্নাকালিকে কিছুতেই রাজি করানো গেলো না।

—তোমাকে আমি সাবধান করে' দিচ্ছি, ঝি, খোকাকে তুমি এখন থেকে কুমার বলে' ডাকবে।

—যা ওর নাম তাই বলে' ডাকবো। আন্নাকালি কথাটা শুনেও শুনলো না।

—হ্যাঁ, ওব নাম হচ্ছে কুমার, নবকুমার। ভদ্রলোকেব বাড়িতে ভদ্রলোকের মতো নাম চাই। বুঝলে?

—আমি তোমাদেব অতোশতো ভদ্দবলোকি সামলাতে পারবো না, ছোট বৌ। আন্নাকালি মুখ ঘুরিয়ে বললে,—চিব-কাল যা বলে' ওকে ডেকে এসেছি তাই বলে' ডাকবো।

—এই সেদিন জন্মালো, এইটুকু ছেলেব আবার চিবকাল কী, জিগ্‌গেস করি? তরলা ঝাঁজিযে উঠলো।

—ও আমার চিরকালেব ছেলে। নিজের পেটে যখন ধবো নি, তখন ও তুমি বুঝবে না, ছোটবৌ।

—আমি বুঝতে কিছু চাইও না। আমার খোকাকে তুমি ঐ বুনো নাম ধরে' ডাকতে পারবে না তাই তোমাকে আগে থাকতে বলে' দিচ্ছি।

—তোমার খোকা?

—তবে কি তোমার?

আন্নাকালি মূঢ় চোখে চারদিকে তাকাতে লাগলো।

তরলা রূঢ় শাসনের ভঙ্গিতে বললে,—অতএব, আমার দেয়া নামেই ওকে ডাকতে হ'বে।

আন্নাকালির গলায় আরেক জন কে কথা ক'য়ে উঠলো: অসম্ভব।

—কী অসম্ভব?

—পারবো না, পারবো না ওকে তোমার নামে ডাকতে। আন্নাকালির গলা সিসের মতো ভারি হ'য়ে উঠলো: ও আমার জানোয়ার। জানোয়ারের মতো ও ওর মা, আমার ঘরের লক্ষ্মীকে খেয়ে গেছে।

—পারবে না? তরলা রাগে লেলিহান হ'য়ে উঠলো: ডাকো দেখি আর ওকে ঐ বিশ্রী নামে। ঘরের লক্ষ্মীকে চলে' যেতে হয়েছে, তা হ'লে এবার তা'র ঘরের ঝিটাকেও চলে' যেতে হ'বে।

এ-ব্যাপারে শেষ পর্য্যন্ত অনাদি এসে নাক ঢোকালে।

আন্নাকালির দিকে মমতা-ম্লান করুণ চোখে তাকিয়ে অনাদি ব'ললে,—নামে কী হয়। নাম একটা যা-হোক ডাকলেই চলে' যায়। নবকুমার—বেশ নাম, খাসা নাম, ছোট্ট করে' আমরা ওকে কুমার বলে' ডাকবো।

—সে আমি পারবো না বাবু, আমার এই কার্ত্তিকের মতো ছেলে। আন্নাকালি ফুঁপিয়ে উঠলো।

—কার্ত্তিকের মতো ছেলেকে তুমি তাই জানোয়ার বলে' ডাকবে, না? তরলা গলা উঁচিয়ে ব'ললে।

—আরে কার্ত্তিকেরই তো আরেক নাম কুমার। অনাদি হেসে উঠলো, কিন্তু সেই হাসিতে কোনো প্রসন্নতা নেই: তোমার কথাটাই তো পুরোপুরি বহাল থাকছে।

—আমি পারবো না বাবু, আন্নাকালির স্বর এবার কান্নায় গলে' পড়লো: এ ওর মায়ের দেয়া নাম।

—আর আমি ওর মা নই? তরলা দৃঢ়, দীপ্ত গলায় বললে।

অনাদির গলা যেন অত্যন্ত ক্লান্ত ও দুর্ব্বল শোনালো: সবই যখন যেতে পারলো, এটাও যাক্। সংসার থেকে তা'র নামটাও তো কবে মুছে গেছে।

—তা'র জন্যে বুকটা যদি বা তবু ভেঙে চৌচির হ'য়ে যেতো! তরলা এবার স্বামীর দিকে তেরছা করে' চোখের একটা খোঁচা মারলো: সেই নাম জপ করতে-করতে তো বনে গিয়ে জানোয়ার সাজতে পারলে না দেখি। এই তরলারই কাছে এসে শেষে হাত পাতলে।

—সেই জন্যেই তো বলছি, অনাদি ধূসর গলায় বললে,—তোমার রাজত্বের জয়জয়কার হোক। হঠাৎ গলা উঁচিয়ে আন্নাকালিকে সে একটা ধমক দিলে: মা যা নতুন নাম রেখে দিয়েছেন তাই তোমাকে ডাকতে হ'বে।

—তা তো আমিও বলছি। আন্নাকালি চোখের জল মুছলে : জানোয়ার ওর মায়ের দেয়া নাম।

—না, এ মা, এ মা যা নাম রাখলো। অনাদি আরেকট অনাবশ্যক ধমক দিলো।

—ছেলের আবার ক'টা মা হয়? বিস্ময়ে আন্নাকালি একেবারে একটা পাঁচের মতো মুখ করলে।

— য'টাই হোক না কেন, আমি বলছি তোমাকে ওর কুমার বলে' ডাকতে হ'বে।

—আমার মুখে ও আসবে না।

—তবে আমাদের মুখেই বা আসছে কী করে' শুনি? অনাদির গলা তপ্ত হ'য়ে উঠলো।

—তুমি পারবে বলে'ই আমি পারবো, তেমন কথা মনে কোরো না, বাবু, আন্নাকালি অভিভূতের মতো বসে' পড়লো : জীবনে কতোই তো তুমি পারলে একে-একে, তোমার অসাধ্য আর কী থাকতে পারে এর পর? কিন্তু সে আমার কাছে তা'র ছেলে জিম্মা করে' রেখে গেছে। তোমার কাছে তা'র কোনো দাম নেই, তা'র উপর সামান্য এ একটা নাম, কেননা তোমার অনেক কিছু আছে, অনেক কিছু তুমি পেয়েছ, কিন্তু, আন্নাকালি হাপুস চোখে কেঁদে উঠলো : আমি ভারি গরিব, আমি ভারি মূর্খ।

অনাদি এবার কী উত্তর দেয় দেখবার জন্যে তরলা তা'র দিকে একটা তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি করলো।

অনাদি রাগে চিড়বিড় করে' উঠলো: তুমি আমাদের কথা শুনবে কিনা বলো?

টলতে-টলতে আন্নাকালি উঠে পড়লো: যতোই তা'র কার্ত্তিকের মতো নাম রাখো বাপু, আমার মুখে তা'র মায়ের দেয়া নামই তোমরা শুনতে পাবে চিরকাল।

—এই বাড়িতে? এতোক্ষণে তরলা তা'র সমস্ত শরীরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো।

আন্নাকালি কিছু কথা বলতে পারলো না। অনাদিও রইলো খানিকটা শূন্যের মতো দাঁড়িয়ে।

অনাদির উপস্থিতিটা তরলাকে সাহসে উত্তপ্ত করে' তুলেছে। সে মরীয়ার মতো বললে,—এই বাড়ি আমার, মনে রেখো, এর প্রতিটি ইঁট, তোমার মাইনের প্রতিটি টাকা। যতো খুশি এর বাইরে গিয়ে তুমি জানোয়ার বলে' চেঁচাতে পারো, কিন্তু এখানে মুখ ফুটে জানোয়ারের 'জা' বললে, তোমাকেও আমার তক্ষুনি 'যা' বলতে হ'বে। তরলা এক পা এগিয়ে এলো: নিজের মূর্খতার তো বড়াই করছিলে, কথাটা কিছু বুঝতে পারলে?

আন্নাকালি ভাঙা, অবসন্ন গলায় বললে,—এ-কথা শুনেও যখন বাড়ি ছেড়ে চলে' যেতে পারলুম না, তখন কথাটা তোমার

মনে-প্রাণে বুঝেছি বলে'ই ধরতে হ'বে। কী করবো বলো, ওকে যখন কিছুতেই ছাড়তে পারবো না, ওর মা যখন আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে বারণ করে' গিয়েছে—তখন জানোয়ারের জন্যে সবই আমাকে সইতে হ'বে।

—আবার! আশ্চর্য্য, তরলার আগে অনাদিই কখন হুঙ্কার দিয়ে উঠলো।

আর সেই গর্জ্জনে তরলা তা'র সর্ব্বাঙ্গে পুলকিত স্পর্দ্ধার একটা বিচিত্র পেখম মেলে ধরলো।

সামান্য একটা নাম নিয়ে কী ছেলেমানুষি যে সে করতে পারলো ভাবতে অনাদি এখন মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

কিন্তু এইটেই বিস্ময়ের শেষ বলে' মনে কোরো না।

একদিন, এতো শাস্ত্র ও শাসনের পর, অনাদিই তা'র ছেলেকে বুকের ওপর তুলে নিয়ে কানে-কানে চুপি-চুপি, প্রায় আত্মহারার মতো তাকে ডাকলে : জানোয়ার!

আর অমনি পিছন থেকে তরলা একটা লাফ দিয়ে উঠলো · কি, কী বলে' ডাকলে ওকে?

অনাদির মুখ যেন কে শুষে নিলে : কই, কখন কী বলে' ডাকলাম।

—আমি বুঝি কিছু শুনতে পাই না ভেবেছ? সব—সব শুনতে পাই।

নেপথ্য

অনাদির মনে হ'লো এ-কথা যেন তরলা বললে না। এ-কথা যেন ঘরের দেয়ালের গায়ে স্পষ্ট লেখা আছে।

অনাদি দুই চোখ তীক্ষ্ণ করে' তাকে দেখতে গেলো। না, দেয়ালের মতোই স্পষ্ট তরলা তা'র সামনে দাঁড়িয়ে।

কাগজের মতো শুকনো, সাদা গলায় সে বললে,—অনেক দিনের অভ্যেস কিনা মুখ দিয়ে কেমন বেরিয়ে আসে।

তরলা কেমন বিশীর্ণ হেসে উঠলো: আগে-আগে যেমন ভুল করে' আমাকেই কিনা তুমি চপলা বলে' ডেকে উঠতে, না?

অনাদির সমস্ত শরীর যেন পুষ্পিত অরণ্যের মতো বিহ্বল হ'য়ে উঠলো। তরলার মাঝে খুঁজতে গেলো সে-নাম, ধরতে গেলো সে-ছায়া।

তরলা আবার তরলাতে মিলিয়ে গেলো। যাবার সময় লীলায়িত তর্জ্জনী হেলিয়ে বললে,—এ-সব বাজে অভ্যেস তোমাকে ছাড়তে হবে।

এক অভ্যেস থেকে আরেক অভ্যেস। অনাদি নিরালম্ব, নিঃসম্বলের মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

এতো সহজে অনাদিকে ছেড়ে দিলেও আন্নাকালির বেলায় তা'র রাশ সে আলগা করতে পারলো না।

একদিন বিকেল বেলা, দেখা গেলো, ঘরের এক কোণে জানোয়ার মাথায় একটা ধামা নিয়ে ভাঙা-ভাঙা পায়ে ফিরিয়ালার

অভিনয় করছে, আর চৌকাঠের পারে বসে’ হাতে একটা জামা নিয়ে আন্নাকালি তাকে একটানা সাধ্য-সাধনা করে’ চলেছে : এসো, এসো জানোয়ার, কেমন এখন রাঙা জামা পরে’ কোলে চড়ে’ তুমি হাওয়া খেতে যাবে। তোমাকে ইষ্টিশানে নিয়ে যাবো’খন, গাড়ি আসবে ধোঁয়া দিতে-দিতে, কতো লোক নামবে পুঁটলি আর প্যাটরা হাতে করে’,—চলো, দেখবে চলো, তোমার মা এলো কিনা জানোয়ার।

জানোয়ারের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

এমন সময়, বলা বহুলতরো হ’বে, মূর্ত্তিমান অবশ্যম্ভাবীর মতো তরলা দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়ালো।

এবার ভ্রূক্ষেপ করলে না আন্নাকালি।

সামনের দিকে ব্যাকুল দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে আন্নাকালি দ্রুত অনর্গলতায় বলে’ উঠলো : শিগগির আয়, শিগগির চলে’ আয়, জানোয়ার, ঐ তোকে ধরে’ নিয়ে যেতে এসেছে।

চোখের সুমুখে তরলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জানোয়ারের খেলাধূলো সব মাথায় রইলো। উঠি-পড়ি করে’ ছুটতে ছুটতে আন্নাকালির কোলের আশ্রয়ে এসে সে রক্ষা পেলে। আন্নাকালির আঁচলের স্তূপে মুখ লুকিয়ে স্বস্তিতে সে উঠলো খিলখিল করে’ হেসে। আর আন্নাকালি তা’র করতলে পৃথিবীর সমস্ত কোমলতা নিয়ে এসে তা’র সমস্ত গায়ে অকৃপণ হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

না বললেও চলতো, রাগে তরলার সমস্ত স্নায়ু-শিরা তখন ছিঁড়ে পড়ছে। হাতে-পায়ে যেন আর কোনো বশ নেই।

কিন্তু সেই অবশ হাতে যে এতো শক্তি ছিলো তরলারো তা বিশ্বাস হ'তো না। কোথা থেকে সে একেবারে একটা ঈগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো। আন্নাকালির বুকের থেকে ছেলেকে সে উপড়ে ছিনিয়ে নিয়ে এলো, বললে, শীতের একটা ঝাপটার মতো বললে,—যথেষ্ট হয়েছে, আর আদিখ্যেতা করতে হ'বে না। আমার ছেলে ঝিয়ের কাছে মানুষ হ'বে এ আমি বরদাস্ত করতে পারবো না।

কাচের বাসনের মতো আন্নাকালি মেঝের উপর ভেঙে খান-খান হ'য়ে গেলো।

আর জানোয়ার তো জানোয়ার, নখে করে' সে বাঘের হিংস্রতা নিয়ে এসেছে, দাঁতে নিয়ে এসেছে সে সাপের বিষ। নিজে না যতো সে হয়রান হ'লো তা'র চেয়ে তরলাকেই সে বেশি ক্লান্ত করে' ফেলেছে।

অমন করে' হাত-পা ছেড়ে চুপ করে' বসে' থাকবার সময় আর যা'রই থাক, আন্নাকালির নেই। পীড়িত মুখে তাকেই আবার উঠতে হ'লো দুই হাতে তাকেই আবার বাড়িয়ে দিতে হ'লো বিশীর্ণ কাকুতি: আয়, আয় বাবা। আমার ওপর না করো, ওর ওপর দয়া করো ছোট বৌ, কাঁদতে-কাঁদতে ও যে প্রায় নীল হ'য়ে গেলো।

তরলা তাকে যেন প্রায় একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলে এমনি দাপটে কথা কইলে: যাও, যাও, মিথ্যে আর তোমার সোহাগ করতে হ'বে না, ছেলে নীল হ'লো কি কালো হ'লো এ-বাড়িতে দাঁড়িয়ে তোমাকে তা দেখতে হ'বে না।

—তা, ওকে দাও আমার কোলে, আমি যাচ্ছি, ওকে বাইরে থেকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি একটু। তারপর আন্নাকালির শুকনো, কুঁচকোনো চোখ দুটো চোখের জলে চকচক করে' উঠলো: তারপর সন্ধে হ'তেই খেয়ে-দেয়ে যখন ও ঘুমিয়ে পড়বে, তখন তোমার কোলে ওকে শুইয়ে দিয়ে আমি চলে' যাবো না-হয়। এখন যে ও বড্ড কাঁদছে!

—থাক্। তরলা মুখ বেঁকিয়ে বললে,—যথেষ্ট আদর দেখিয়েছ। মা'র চেয়ে যে ভালোবাসে তাকে বলে ডা'ন।

এতো দুঃখেও আন্নাকালিকে বুঝি একবার হাসতে হ'লো। বললে,—যদি বলো, আমি তা'র চেয়েও খারাপ, ছোটবৌ। আমি একটা ঝি।

—তবে ঝি-র মতোই ব্যবহার করতে শেখো! জলের মধ্যে বঁড়শিতে-বেঁধা মাছের মতো ছেলেকে তরলা সাপটে ধরেছে।

—তাই করবো, কিন্তু ওর কান্না যে শোনা যাচ্ছে না।

—শোনা যাচ্ছে না তো কে শুনতে বলছে? সোজা রাস্তার গিয়ে দাঁড়ালেই তো পারো।

—তা পারি, কিন্তু আগে একটু ওকে থামতে দাও।

—কেন থামতে যাবে? তরলা রুখে উঠলো: ওর নিজের বাড়িতে যতো খুসি ও কাঁদবে, তোমার তাতে কী? এমন কোন্ বাড়িটা তুমি দেখাতে পারো, যেখানে ছেলে-পিলে কাঁদে না একটুও? বোবার মতো মুখ বুজে বসে' থাকে?

—তবু, কী রকম করছে দেখ, আন্নাকালি কাতর গলায় বললে,—আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। ওকে একটু খানি আমাকে ঠাণ্ডা করতে দাও, ছোট বৌ, আমার কোলে ও মানুষ হচ্ছিলো!

তরলা ঝামটা দিয়ে উঠলো: তোমাকে দিয়েই যদি ছেলে মানুষ করা চলতো তো আমাকে আর সাধ করে' ডেকে আনা হয়েছিলো কেন?

এতোটা যেন আন্নাকালির সহ্য হ'লো না। শূন্য হাতে চোখের জল মুছতে-মুছতে সে সরে' পড়লো।

সন্ধেবেলা আপিস থেকে অনাদি একটু ব্যস্ত হ'য়েই বাড়ি ফিরলো। ছেলের কান্নায় দেখতে-দেখতে বাড়ির সমস্ত চেহারা গেছে বদলে। সেই কান্নায় তরলার জাজ্জ্বল্যমান উপস্থিতিটা পর্য্যন্ত অস্পষ্ট হ'য়ে এলো। ছেলের কান্নার মধ্য দিয়ে আর কিছু সে দেখতে পেলো না।

তাই তা'র গলায় এলো হঠাৎ অনাবশ্যক ধার; বললে,—

এতো দিনকার পুরোনো ঝি, আন্নাকালিকে তুমি তাড়িয়ে দিলে ?

—তাড়িয়ে দিলাম ? তরলা তখন একহাতে জোর করে' খোকার পা দুমড়ে ধরে' আরেক হাতে মোজা পরাবার চেষ্টা করছিলো, তেলে-বেগুনে জ্বলে' উঠলো : তোমাকে কে বললো শুনি ?

—কে আবার বলবে ? এক নিমেষেই অনাদি তা'র গলা নামাতে পারলো না : আমি যে নিজের চোখে দেখে এলাম ।

—কী দেখে এলে ?

—ইষ্টিশানের পোলের ধারে একা বসে' সে কাঁদছে, সঙ্গে তা'র আজ খোকা নেই, নবকুমার নেই ।

—তুমি তখুনি গদোগদো হ'য়ে রুমাল দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে গেলে বুঝি ? তরলা দাউ-দাউ করে' উঠলো : আর মিথ্যুক মাগী বুঝি অমনি আমার নামে তোমার কাছে লাগালো, বললে, আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি ?

—সে আমাকে কিছুই বলতে আসেনি, অনাদির গলা প্রচ্ছন্ন বিরক্তিতে গম্ভীর হ'য়ে এলো : তাকে একা বসে' কাঁদতে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম । কী যে ভীষণ ভয় পেলাম, তরলা, কী বলবো । দূর থেকে হাঁপাতে-হাঁপাতে ছুটে এসে তাকে জিগ্‌গেস করলুম : খোকা—কুমার কোথায় ?

—সে কী বললে?

—বললে, তুমি তাকে সঙ্গে করে' নিয়ে আসতে দাও নি।

—আর সেইটেই তাকে তাড়িয়ে দেয়া হ'লো বলছ? তরলার জিভটা ঘৃণায় সূক্ষ্ম হ'য়ে এলো: তুমি কি আপিস করো, না, ঘাস খাও?

—হ্যাঁ, সেইটেই তাকে তাড়িয়ে দেয়া হ'লো, তরলা। অনাদি ধূসর গলায় বললে,—সঙ্গে তা'র খোকা নেই, তার মানে এ-বাড়িতে আন্নাকালিও আর নেই।

—নেই তো নেই, বাঁচা গেছে। তরলা তখন খোকার গলায় জামার বোতাম আঁটছে না ফাঁস বাঁধছে বোঝা দুষ্কর: ছেলে যেন ওরই আর-কি। ওরই যেন মৌরসি স্বত্ব।

—বেশ তো, ও থাকতোই না ওর কাছে, অনাদি ছেলেটার এ-দুর্গতি আর চোখ মেলে দেখতে পারছিলো না: ওকে ছাড়াও তো তোমার কতো কাজ, কতো জায়গা ছিলো, তরলা।

—তোমাকে একশোবার বলেছি না, তরলা একেবারে একটা বোমার মতো ফেটে পড়লো: এ-বাড়ির সব কিছু এখন আমার, আমার ছেলে, আমার স্বামী, আমার ঝি!

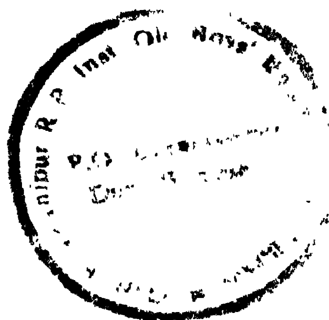
—কিন্তু আর যাই হোক, অনাদি আমতা-আমতা করে' বললে,—ঝি-টির ওপর তুমি ভারি অবিচার করেছ।

—শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে দিয়ে যে তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয় নি সেইটেই যেন সে ভাগ্য বলে' মনে করে।

অনাদি এক মুহূর্ত্ত গাম্ভীর্য্যে অটল হ'য়ে দাঁড়ালো, ছেলের দিকে লক্ষ্য করে' বললে,—ও হ'বার অনেক আগে থেকেই এ সংসারে সে আছে, যখন আমরা প্রথম এখানে আসি, সে আজ কত্তোদিনের কথা। ওর মা ওকে কতো সমিহ করে' চলতো। ওকে কঠিন কথা কিছু না বললেই পারতে।

—বলেছি, বেশ করেছি। তরলা গর্জ্জে' উঠলো : রাজ্যে যেন আর ঝি নেই, অবাধ্য, দুর্দ্দান্ত কোথাকার! ওর মা কী করতো না-করতো সে-কথা আমাকে বলতে এসো না। আমিই ওর মা।

এর পর অনাদি আর কী বলতে পারে?



আট

অনাদির কিছু বলবার নেই বটে, আরেক জনের ছিলো।

তরলাই এখন মা, অথচ এই মা'র কোলে এসে নবকুমার এক মুহূর্ত্ত চুপ করে' থাকে না, দিনরাত কান্নার তা'র এলোমেলো তুফান চলেছে। ওকে যেন মানা করে' দেয়া হয়েছে তরলার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে, তরলার বুকে শুয়ে ঘুমোতে, তরলার নাক-মুখ-চোখ নিয়ে খেলা করতে।

অথচ বলো, নিজের পেটে ধরলেই বা তরলা এর চেয়ে আর কী বেশি করতে পারতো? তরলার শরীরে কোথাও এতোটুকু একটা ক্লান্তির রেখা নেই, রাত-দিন এই ছেলে, তা'র নবকুমারের পরিচর্য্যায় সে প্রচুর হ'য়ে উঠেছে। কড়ি-কাঠে রিঙ বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে দোলনা, নেটের রঙিন মশারির ভেতর ঝুলিয়ে দিয়েছে বল্, কতো খাবার, কতো খেলনা, ময়রা আর মনোহারির দোকান সাজিয়ে দিয়েছে দু'পাশে—তবু ছেলের মন ওঠে না। ঐ যেটুকু সময় সে ঘুমোয়, আর সময় নেই, অসময় নেই, সারাক্ষণই তা'র চীৎকার।

সেই চীৎকারে বাড়িটার চেহারা কেমন বিশীর্ণ বিমর্ষ হ'য়ে পড়েছে। যেন বসতিহীন গভীর কোন জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা, পোড়ো বাড়ি। সব সময়েই গা-টা কেমন ছমছম করে, চারপাশটা কেমন অনাবশ্যক ফাঁকা, ছাড়া-ছাড়া লাগে। হাত বাড়িয়ে দেয়ালগুলোকে যেন আর হাতের কাছে পাওয়া যায় না, হাত বাড়াতে গেলেই কেমন তারা হেঁটে-হেঁটে সরে' দাঁড়ায়। যেন সেই আগেকার আঁট, ঠাসা, ঘন আবহাওয়াটা আর নেই, এই চীৎকারে শতছিদ্র হ'য়ে গেছে। সবখানেই কেমন একটা যেন বিশ্রী বিশৃঙ্খলা, রাত না হ'তেই অন্ধকারের ছায়া পড়েছে এমনি একটা অর্থহীন আতঙ্ক।

দিনের বেলায়, নানা কাজের অবকাশে তরলা এই কান্নার তবু একটা অর্থ খুঁজে পায়, কিন্তু মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে থেকে নবকুমার যখন একেকটা হঠাৎ উন্মাদ আর্ত্তনাদ করে' ওঠে, তখন সে-কান্নায় তরলার আর মায়া বা রাগ হয় না, নিরাবরণ, নিরবয়ব একটা ভয় করতে থাকে। এ যেন নবকুমারের গলা নয়, কোনো নিদ্রাহীন নিশাচরীর গলা! তাই এটা একটা শোকের কান্না নয়, দুঃস্বপ্নের কান্না!

কিন্তু ভয় করলে তরলার চলবে কেন? সে জিততে এসেছে, ভয় পেয়ে অবলীলায় তা'র ভাগ সে ছেড়ে দিতে আসে নি।

তাই মশারি তুলে বাইরে তাকে চলে' আসতে হ'লো।

বালিসের তলা হাতড়ে কুড়িয়ে নিতে হ'লো দেয়াশলাই। টোপের নিচে পাথরের বাটিতে পান্তুয়া একটা সে লুকিয়ে রেখেছে, এটা এখন নবকুমারের মুখে পুরতে হ'বে।

আশ্চর্য্য, মশারির থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে-আসতে তরলা ভাবলে, এতো কান্নাতেও, অনাদির এমন দৃঢ়কায় ঘুম, এক ইঞ্চিও কোথাও টললো না, শুধু তাকেই যেন কে ঠেলে জাগিয়ে দিয়েছে।

তরলা দু' আঙুলে স্পষ্ট একটা কাঠি ধরালে। আর স্পষ্ট কে যেন তা'র হাতের ওপর নুয়ে পড়ে' ফুঁ দিয়ে কাঠিটা নিবিয়ে দিলো।

অবশ হাতে তরলা আবার চেষ্টা করলো। চকিত শিখায় কাঠিটা উঠলো ধরে', আর তক্ষুনি, তরলা সেই আলোতে স্পষ্ট শুনতে পেলো, ছোট-ছোট স্ফুলিঙ্গে কে যেন হঠাৎ খিলখিল করে' হেসে উঠেছে।

দেয়াশলাই ধরলো বটে, কিন্তু হাতের কাছে লণ্ঠনটা কিছুতেই খুঁজে পাওয়া গেলো না। সিসের মতো ভারি একটা অন্ধকার, বাড়ি-চাপা-পড়া একটা অতিকায় অসহায়তার মতো। তার ভেতর থেকে আবার নবকুমারের সেই কান্না।

তরলা অনাদিকে হঠাৎ ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিলে: তুমি শুনতে পাচ্ছ না, কুমার কী রকম কাঁদছে!

—কাঁদছে ? কে ? অনাদি ধড়মড় করে' উঠে বসলো।

—কে আবার কাঁদবে ? কুমার। উঠে আলোটা একবার জ্বালো।

—ও, কুমার ? যেন গভীর হতাশায় অনাদি বালিসের উপর ঢলে' পড়লো : ঠাট করে' তখন আন্নাকে না তাড়ালেই হ'তো।

—আর, যাদের বাড়ি আন্না নেই, তাদের ছেলে কি আর কোনোকালে বড়ো হয় ?

—যাদের আন্না নেই, তাদের আবার আর কেউ থাকে হয়তো।

—এতোই যখন মায়া, কথাটা তরলা অন্ধকারে আর তলিয়ে দেখতে চাইলো না : তখন আন্নাকে বেখে আমাকে তাড়িয়ে দিলেই পারতে। কোনো কথা নেই, অনাদি কখন নিটোল নিশ্চিন্ততায় ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু ঘুমোনো তরলার অদৃষ্টে লেখা নেই, সে মা, তা'র ছেলেকে এখন শান্ত করতে হ'বে। কিসের ভয়, দৃঢ় হাতে তরলা লণ্ঠন জ্বালালো। খাবার যদি নবকুমার মুখে না-ই তোলে, কোনো উপায় নেই, কাঁধে করে' ঘরময় তাকে পাইচারি করে' বেড়াতে হ'বে।

নবকুমারকে শান্ত করবার জন্যে ভয়ে-ভয়ে ছোট-ছোট পায়ে তরলা ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সঙ্গে-সঙ্গে আর যেন কে

তা'র পায়ে-পায়ে নিঃশব্দে পদচারণা করছে। তরলা যেমনি তাড়াতাড়ি মোড় ঘুরে যাচ্ছে, সেও অমনি পেছনে চলে' যাচ্ছে পালিয়ে। যদি তুমি দাঁড়িয়ে থাকো, সেও অমনি দাঁড়িয়ে পড়লো।

তরলা যেন নবকুমারকে নয়, কা'র যেন মৃত, গলিত একটা হৃৎপিণ্ডের বোঝা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তা'র একবার ইচ্ছে হ'লো এই মাংসপিণ্ডটা জানলার বাইরে সে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। নিশ্চিন্ত, নির্ম্মল, পরিচ্ছন্নতায় আবার সে তা'র স্বামীর পাশে শুয়ে ঘুম যায়, সেই প্রসারিত, উচ্ছ্বসিত তৃপ্তিতে। সমুদ্রের কল্লোলের মতো সে-ঘুম, কতো জীবন সে যেন ঘুমুতে পারে নি। কী হ'বে এই মরুভূমিতে বর্ষণ নিয়ে এসে, তরলা এবার নিজে অবগাহন করুক, তা'র ঘুমে, তা'র অবসাদে, তার অন্ধকারে।

মশারিটা যেন কে আস্তে-আস্তে তুলতে লাগলো।

—তুমি দেখছ না, দেখতে পাচ্ছ না তুমি? তরলা হঠাৎ দিগ্বিদিক হারিয়ে চীৎকার করে' উঠলো: ওঠো, ওঠো শিগগির।

—কেন, কী হ'লো? ঘরে আগুন লাগলো না কেউ আত্ম-হত্যা করলো অনাদি কিছু বুঝতে না পেরে বোবা গলায় আরেকটা চীৎকার করলে।

—মশারি তুলে তোমার বিছানায় কে ঢুকে পড়লো। তরলা কাঁপছে, কথা বলতে পারছে না।

—আমার বিছানায়? অনাদির যেন এতোক্ষণে হুঁস হ'লো, হাতড়ে হাতড়ে বিছানাটা একবার সে ভালো করে' অনুভব করলে: কৈ, কোথায়?

তরলা নিজেই এবার পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্যে খাটের কাছে এগিয়ে এলো: আমি তখন দেখলুম যে স্পষ্ট করে,—কে তোমার মশারি তুলে গুটি-গুটি ঢুকে পড়ছে।

ভয়ে তরলা শুকিয়ে একেবারে এতোটুকু হ'য়ে গেছে। অনাদি তাকে ব্যস্ত হ'য়ে সামনে টেনে আনলো। বললে,—কা'কে দেখলে বলো তো? চোর-ডাকাতের মতো মনে হ'লো?

স্বামীর স্পর্শের উত্তপ্ত পরিমণ্ডলে চলে' এসে তরলার এতো-ক্ষণে সাহস হ'লো বোধ হয়। তাই সে দস্তুর মতো রাগ করতে পারলো, বললে,—ঘরের দরজাটা যে বন্ধ আছে, দেখতে পাচ্ছ না? আর চোর-ডাকাত এসে সুনিদ্রা দেবার জন্যে তোমার বিছানায় গিয়ে ঠাঁই নেবে মনে করো নাকি?

—তবে কে? অনাদি যেন কিছু বুঝতে পারছে না এমনি মূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলো।

—আমার মরণ! বিছানায় যেতে-যেতে তরলা স্বামীর গায়ে একটা ধাক্কা দিলো: এবার সরো দিকি, আমাকে ঘুমুতে দাও।

নবকুমার এবার যতোই কেননা কাঁদুক, তরলা আর কিছুতেই বিছানা ছেড়ে উঠে যাচ্ছে না।

কাঁদতে-কাঁদতে নবকুমারের অসুখ করে' গেলো। দু' চোখে তরলা আর কোনো পথ পেলো না। ব্যস্ত হ'য়ে বললে,—শিগগির ডাক্তার ডাকো।

—এই সামান্য একটু গা-গরম হয়েছে কি না, অনাদি আদপেই কথাটা গায়ে মাখলো না: ডাক্তার দিয়ে কী হ'বে?

—না, কী যেন ওর হয়েছে, ও ভালো করে' চাইছে না, ভালো করে' কাঁদছে না পর্য্যন্ত, তরলা কাতরতায় গলে' পড়লো: শিগগির ডাক্তার ডেকে আনো বলছি।

—ভালো করে' কাঁদছে না তো ভালো কথা। কান্না ওর থামুক তাই তো আমরা চাইছিলাম এতো দিন।

—তার মানে? আহত সাপের মতো তরলা হঠাৎ ফণা তুললে।

—মানে, এই বলছিলাম কিনা, অনাদি শুকনো একটা ঢোঁক গিললো: কচি ছেলে, এমনিতেই সেরে যাবে, ডাক্তারের কী দরকার!

—দরকার না-দরকার তুমি তা'র বুঝবে কী? তরলা ঝামটা দিয়ে উঠলো: ছেলের দরকার না হয়, আমার দরকার, ডাক্তার তোমাকে আনতেই হ'বে।

অগত্যা ডাক্তার এসে ব্যবস্থা করে' গেলো।

কিন্তু বলতে কি, ছেলের গলায় সেই কান্না আর আসে না। সেই তার পুরোনো অভিযোগ, সেই তার তেজী, দুর্দ্দান্ত আর্ত্তনাদ।

এখন যদিও না সে মাঝে-মাঝে কাঁদে, দুপুরের রোদে ছাদের কার্ণিশে বসে' ডেকে ওঠা একটা কাকের আওয়াজ।

দিনের পর দিন ডাক্তারের আনাগোনা, ব্যবস্থার পর ব্যবস্থা, এটা নয় তো ওটা, ছেলের গলায় কণ্ঠস্বরের সেই উত্তাল উগ্রতা নেই। থেকে-থেকে শুধু ক্ষীণ একটু গুঙিয়ে উঠছে, পোড়ো বাড়ির শূন্যতায় পড়ে হাওয়ার অন্ধ কাৎরানির মতো। যেন কতো তা'র কাঁদবার ছিলো, কিন্তু কিছুই সে প্রকাশ করতে পারছে না। চাপা একটা কান্না তাকে যেন কুরে-কুরে খাচ্ছে, সেই চাপা কান্নায় তা'র গায়ে এসেছে অসুখের, এই বীভৎসতা। চিকিৎসার ত্রুটি হচ্ছে এ-কথা তুমি বহু চেষ্টাতেও বলতে পারো না, এটাকে সেবার অসম্ভব অপচয় না বলে সেবার অভাব বললে আকাশকে তবে খানিকটা শূন্য বলে' ভাবতে হয়। তবু, এতোতেও, ছেলের গায়ে মাংসের আর আভাস নেই, কণ্ঠস্বরে নেই কান্নার সেই শিহরণ। না কাঁদতে পেয়ে গায়ের হাড় পড়ছে তার বেরিয়ে, চামড়া আসছে পাৎলা হ'য়ে—দিন-দিন। দেখতে হচ্ছে একটা সদ্যস্ফুটিত পাখির ছানার মতো বীভৎস। তাকে নিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে তরলা শ্রান্তিতে কালি হ'য়ে গেলো। না কাঁদে, না কাঁদুক, একটুখানি হাসতে বা তা'র বাধা কী। কতো আদর, কতো সোহাগ, তবু তা'র মুখে হাসির একটি রেখা ফোটানো গেলো না। তাকে যেন মাথার দিব্যি দিয়ে হাসতে কে বারণ করে' দিয়েছে!

কলকাতা থেকে নামজাদা ডাক্তার না আনিয়ে তবলা ছাড়বে না।

—ওর জন্যে দেখছি আমার প্রায় ফতুর হ'বার জোগাড়। অনাদির মুখ বিরক্তিতে বোধ করি রুক্ষ হ'য়ে উঠলো।

—ওর জন্যে মানে? আমি বলছি তোমাকে আমার জন্যে ডাক্তার নিয়ে আসবে।

—তোমার আবার কী হ'লো?

—আমি আর আমার ছেলে আলাদা নাকি?

অনাদি হতাশ মুখে বললে,—তোমার এই বিলাসিতার ভার আমি আর বইতে পারি না, তবলা।

—বিলাসিতা? আমার ছেলেকে আমি অচিকিৎসায় মরতে দেবো না এটাকে তুমি আমার বিলাসিতা বলতে চাও? তবলা একটানে তা'র হাতের চুড়িগুলো খুলে ফেললো। নাও, নাও এগুলো, এদিয়ে আমার ছেলের জন্যে তুমি ডাক্তার নিয়ে এসো। হাঁ করে' দাঁড়িয়ে আছো কী, বিলাসিতার ভার তো আমিই নামিয়ে ফেলছি একেবারে।

কলকাতা থেকেও ডাক্তার এসে গেলো, কিন্তু কিছুরই কোনো সুরাহা হ'লো না।

অনাদি বললে,—তুমি এমনি খালি হাত-পায়ে থেকো না, তরলা, গয়নাগুলো গায়ে দাও।

—খালি হাত-পা মানে? তরলা মিনতিতে বিশাল, অসহায় দু'টি চোখ তুলে স্বামীর মুখের দিকে তাকালো: আমার দু'হাত ভরা আমার ছেলে, তুমি দেখতে পাও না?

—কিন্তু তোমার দিকে যে আর তাকাতে পাচ্ছি না, তরলা।

—থাক, দয়া করে' এখন কেবল ছেলেব দিকে তাকাও।

—তবু—

স্বামীর হাতটা দূরে ঠেলে দিয়ে তরলা বললে,—রাখো। রাখো ওগুলো সরিয়ে। কখন কী কাজে লাগে কিছুই বলা যায় না।

এইখানটাতেই অনাদির মন উঠছিলো না যে জমকালো গয়নাগুলি খুলে ফেলে তরলা কেমন আলাদা হ'য়ে উঠেছে। তা'র সেই উচ্ছল ফেনিলতার আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, কেমন স্তিমিত হ'য়ে এসেছে মেঘমলিন শীতল একটি সন্ধ্যার মতো। পুঞ্জিত শরীরে গম্ভীর একটি ঔদাস্য। প্রায় যেন চপলার মতো দেখতে। তখনকার দিনে চপলার এতো সৌভাগ্য ছিলো না, গায়ে তা'র ছিলো পবিত্র একটি দরিদ্রতা, নির্ম্মল একটি শুচিস্মিতি—এখনকার তরলা যেন তা'রই প্রতিবেশিনী, তা'রই প্রতিধ্বনি হ'য়ে উঠেছে। গায়ে আর তা'র সেই দ্যুতিমান অহঙ্কার নেই, লুটিয়ে পড়েছে সন্তান-স্নেহের স্নিগ্ধ একটি জ্যোৎস্না, শীতল একটি প্রশান্তি। তাই তো অনাদি তা'র দিকে চোখ মেলে তাকাতে পারছে না, আবার কী রকম তা'র ভুল হ'য়ে যাচ্ছে।

কিন্তু সেদিন তরলার কোনো ভুল করবার কারণ ছিলো না।

ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘরে বারান্দায় অনবরত পাইচারি করছে, তরলার এক সময় মনে হ'লো কে যেন পেছন থেকে এসে কাঁধের উপর থেকে নবকুমারকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে তা'র হাত ধরে' নির্ম্মম একটা টান দিলো।

—কে ? তরলার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা একটা ভয়ে অসহ্য কাঁটা দিয়ে উঠলো।

প্রশ্নটা জিগ্‌গেস করে' তার উত্তর পাবার জন্যে সেখানে সে এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করতে পারলো না, ত্রস্ত দ্রুত পায়ে ছুটে এলো ঘরের মধ্যে, আলোর আশ্রয়ে। দুই অজস্র হাতে নবকুমারকে অনুভব করতে লাগলো, ঝরিয়ে দিলো তা'র অকৃপণ আশীর্ব্বাদ। আলোর কাছে তা'র মুখ নিয়ে এসে ভীত, বিহ্বল গলায় সে আবার জিগ্‌গেস করলে : কে রে, কে রে, নবকুমার ?

নবকুমারের মুখে সে-উত্তর স্পষ্ট লেখা আছে।

ভয়ে তরলা একটা স্তূপীভূত পাথর হ'য়ে গেলো বুঝি। এতো দিনে, এ-প্রশ্ন জিগ্‌গেস করবার পর, নবকুমার আজ হেসে উঠেছে। মৃত, বিবর্ণ, নিরবয়ব সে-হাসি। তা'র নিতল নিঃশব্দতায় ভয়ঙ্কর তা'র মুখরতা।

অনাদিকে সে তারপর সরাসরি গিয়ে বললে,—আমরা এ-বাড়ি ছেড়ে পালাই এসো।

প্রশ্নটার হাওয়া যে কোনদিকে বইছে অনাদি কিছু বুঝতে পারলো না : কেন?

—এ-বাড়ি থাকলে ছেলে আমার ভালো হ'বে না।

—তোমার আবদারের যে আর সীমা নেই দেখছি। অনাদি হাল ছেড়ে দিলো : চাকরি-বাকরি ফেলে ছেলে নিয়ে আমি এখন চেঞ্জে যাই।

—না, চেঞ্জে কেন? এইখানেই, আর কোনো একটা বাড়িতে।

—এইখানেই? অনাদি হেসে উঠবে কিনা বুঝতে পারলো না : কেন, এ-বাড়িটা কী দোষ করলো? এমন খটখটে পাকা বাড়ি, চারিদিকে এমন খোলা-মেলা—

—তা হোক, তরলা ভীত, আর্ত্ত মুখে বললে,—এ-বাড়িটা ভালো নয়, এ-বাড়িতে সব সময় যেন কে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—তা তো সব সময়েই আমি দেখতে পাচ্ছি।

—দেখতে পাচ্ছ? তরলা চীৎকার করে' উঠলো : কা'কে?

অনাদি উঠলো হেসে : কা'কে আবার! তোমাকে। তুমিই তো সব সময় তোমার ছেলে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ।

—না, আমি নয়। তরলা নয়, ঘরের দেয়াল যেন কথা কইলো : আর কেউ। সত্যিকারের যা'র এই ছেলে সত্যিকারের যা'র এই ঘর-দোর।

—তুমি কী বলছ যা-তা ? অনাদি ব্যাকুল হাতে তরলাকে ধরে' ফেললো : রাত-দিন না ঘুমিয়ে তুমি দুঃস্বপ্ন দেখতে সুরু করেছ।

—আমার সমস্ত জীবনটাই দুঃস্বপ্ন। আমার এখান থেকে কোথাও চলে' যেতে ইচ্ছে করছে।

—কেন, তুমি যাবে কেন ? তোমার এ বাড়ি-ঘর, তোমার এ-ছেলে, তোমার এ-সংসারের প্রতিটি ধূলিকণা। অনাদি তাকে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করলো : তুমি কেন হার মানবে, দাবী ছাড়বে তোমার অখণ্ড পৃথিবীর ? কী না কী অন্ধকারে তুমি দেখ, সে তোমার শুধু আমাকে সন্দেহ, আমাকে অবিশ্বাস। তরলাকে অনাদি আরো কাছে টেনে আনলো : তুমি কি এতো দিনেও কিছু বুঝতে পারলে না, তরলা, আমার এই অফুরন্ত ভালোবাসা ? সে তো কবে ধূলো হ'য়ে হাওয়ায় উড়ে গেছে ! তাকে তো কবে আমি তোমার মাঝে বিসর্জ্জন দিয়েছি ! আমাকে তুমি এখনো কেবল সন্দেহ করছ, তাই তোমার প্রতিপদে ভয়, প্রতি বিশ্বাসে যন্ত্রণা ! আর তোমাকে এমন ভালোবাসতে দিলে বলে'ই আমাকেও তুমি এ-যন্ত্রণার ভাগ দিচ্ছ।

—কিন্তু দেখ, দেখ, তরলা সচকিত হ'য়ে উঠলো : নবকুমার এমন হেসে উঠছে কেন ?

—ভালোই তো, ওর হাসিই তো তুমি চেয়েছিলে। শরীর এখন ওর বেশ ভালো আছে ব'লেই হাসছে।

—এ তোমার শরীর ভালো থাকবার চেহারা ? দেখ দিকি ওর এই হাসিটা ? আমাদের মুখের দিকে চেয়ে ও একটা তীক্ষ্ণ ঠাট্টা করছে না ?

—তোমাকে নিয়ে আর আমি পারলাম না, তরলা। অনাদি উঠে পড়লো : বেশ, ওই তো তোমার ভয়, বলো তো আমি ওকে আজই হাসপাতালে রেখে দিয়ে আসি। তুমি একটু খোলা হাত-পায়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচো ক'দিন।

—কী বলো তুমি ! পাগল ! অসহায়, নিষ্প্রভ একটু হেসে তরলা নবকুমারকে বুকের মধ্যে নিপীড়ন করে' ধরলো।

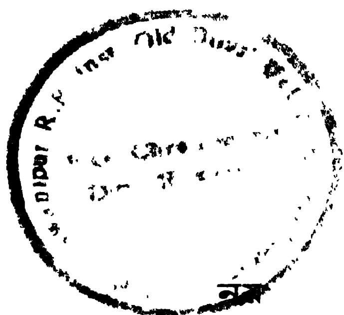
তরলা তারপর আঁট করে' ঘরের খিল লাগালো, আলোটা আজ আর নিবতে দিলো না।

তাইতেও তার স্বস্তি নেই। জানলার গরাদের ওপারে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে, অলক্ষ্যে বাড়িয়ে দিয়েছে তার হাতের শীর্ণতা। কোথায় মানুষের কণ্ঠে হাওয়া উঠেছে কাতরোক্তি করে'। কক্‌খনো নয়, কক্‌খনো তোমার নয়, এ-ছেলে আমার, আমার এ-ছেলে।

তরলা নবকুমারকে বুকের পাঁজরের উপর পিষে ধরলো। সে ছাড়বে না তা'র দাবি, হারবে না তা'র অতিকায় আত্মদৈত্যের কাছে। হাওয়ায় কথা অমন একটা ভেসে এলেই তো আর হ'লো না।

—কক্খনো না, নবকুমারের কপালে তরলা একটা ছোট্ট চুমু খেলো : আমার এ-ছেলে।

তক্ষুনি সে আলোয় গিয়ে দাঁড়ালো। হ্যাঁ, তক্ষুনি আবার নবকুমার বিশীর্ণ মুখে বীভৎস হেসে উঠেছে।



—কী হে, তোমার যে আর দেখা পাওয়া যায় না! এক সন্ধ্যায় বন্ধুদের শিরোভূষণ হ'য়ে এসে অমৃতই প্রথম হাঁক পাড়লো।

—এসো, এসো, অনাদি তাদের বাইরের ঘরে নিয়ে এলো: ক'দিন থেকে ছেলেটার ভারি অসুখ।

—তার জন্যে বাড়ির বা'র হওয়া যায় না? শ্রীশ একটা চিমটি কাটলো: আর কিছু আকর্ষণ আছে বলো।

—আকর্ষণ আছে, অনাদি শ্রান্ত মুখে একটু হাসলো: কিন্তু তোমাদের মনের মতো করে' হয়তো বলতে পারবো না।

—তোমার মনের মতো করে' বলতে পারলেই যথেষ্ট। অমৃত বন্ধুদের দিকে চেয়ে একবার চোখ টিপলো: নইলে আমাদের ঘরেও ছেলেপিলের অসুখ হয়!

—অসুখটা যে ক'দিন থেকে ভারি বাড়াবাড়ি যাচ্ছে।

—কী যে বাড়াবাড়ি যাচ্ছে তা আর আমাদের বুঝিয়ে বলতে হ'বে না। সন্তোষের কথায় সবাই একবাক্যে অনাবৃত হেসে উঠলো।

অনাদির ভালো লাগছিলো না অন্তত আজকের আলাপটা এরকম একটা ধারা নেয়, কিন্তু উপায় নেই, মফস্বলের পুরুষের আড্ডায় সাধারণ যা নিয়ম, একে-অন্যের স্ত্রী সম্বন্ধেই আলোচনা করতে হ'বে।

তাকে যেন সম্বর্দ্ধনা করছে এমনি উদার ভঙ্গিতে অমৃত তা'র পিঠ ঠুকে দিলো: তা হ'লে স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমে পড়ে গিয়েছে বলো!

—পড়বে না? শ্রীশ বললে,—এ যে দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী। হারানো রতন।

অনাদি অমৃতকে লক্ষ্য করলে: তা'র বদলে তোমরা তবে কী চেয়েছিলে আমার কাছে?

—বিয়ে করে' তাই বলে' এ-রকম কবি হ'য়ে উঠবে আশা করি নি।

—কী আশা করেছিলে?

—ভেবেছিলুম ভদ্রলোকই থাকবে বরাবর। খাবে-দাবে, আপিস করবে—

—আর সন্ধ্যের সময় তাস পিটবে আমাদের সঙ্গে। সন্তোষ আকস্মিক উত্তেজিত হ'য়ে বললে।

—যদি বলো তো, তাস পেড়ে আনতে পারি—আমার দৈনিক রুটিন থেকে যেটুকু বাদ প'ড়েছিলো মনে করো। অনাদি হাসবার একটা অমানুষিক চেষ্টা করলো: নইলে, তা ছাড়া আর কী করছিলুম বলো ?

—স্ত্রীর প্রেমে হাবু-ডুবু খাচ্ছিলে। তাস খেলবার জন্যে গোল হ'য়ে বসতে-বসতে শ্রীশ আর সন্তোষ একসঙ্গে বলে' উঠলো।

—বিশেষতো দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। অমৃত একটা কুটিল ইঙ্গিত করলো।

অনাদির সমস্ত কথায় শান্ত একটি ব্যথা যেন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো: ভালোবাসতে পারি আমরা অনেক স্ত্রীলোককে, কিন্তু স্ত্রী বলতে আমাদের সেই একজন, আমাদের যিনি প্রথমা। যতোটাই তুমি বিয়ে করো না কেন, সেই প্রথমার মতো কেউ নয়। আর সব বাসি, মাত্র একটা অভ্যেস। শুধু শরীর ও মনের নিয়ম বাঁচিয়ে চলা।

হঠাৎ, অনাদির মুখে কথাটা শেষ হ'তে-না-হ'তেই, কোথা থেকে একটা বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ অট্টহাসি দেয়ালে-দেয়ালে হা-হা করে' উঠলো। অট্টহাসি, কিন্তু শোনালো একটা আর্ত্তকণ্ঠের

কঠিন চীৎকারের মতো। সবাই ক্ষণকালের জন্যে স্তব্ধ, সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলো। চীৎকারটা যেন বাড়ির ভিতর থেকে গড়িয়ে-গড়িয়ে এ-ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই যে-যা'র পায়ে খাড়া হ'য়ে দাঁড়ালো।

আগাগোড়া ভীষণ অন্ধকার। সন্ধ্যার এ-সময়টায় এতো অন্ধকার হ'বার যেন কথা নয়। সেই অন্ধকার যেন কা'র স্থূল, দুর্ভেদ্য একটা উপস্থিতির মতো। সবল দুই হাতে সেটাকে ঠেলে তবে অনাদিকে ঘরের চৌকাঠের কাছে এসে পৌঁছুতে হ'লো।

অবশ, নির্ব্বাপিত গলায় ডাকলে : তরলা।

কোনো সাড়া নেই, নিরুত্তর, নিশ্চেতন অন্ধকার। খোকা,—নবকুমারের গলায় পর্য্যন্ত অস্ফুট একটা শব্দ শোনা গেলো না।

ঘরের স্পষ্ট কিছু হদিস পাওয়া যাচ্ছে না, অন্ধকারের ভারে ঘরের বাতিটাও পর্য্যন্ত নিবে গেছে। দেয়াশলাইয়ের জন্যে অনাদি পকেট হাতড়ালে—দেয়াশলাইটা বাইরের ঘরে সে ফেলে এসেছে। তার জন্যে অন্ধের মতো দেয়ালে-চৌকাঠে ঠোকর খেতে-খেতে স্খলিত পায়ে বাইরের ঘরের দিকে সে রওনা হ'লো। আর দেয়াশলাই নিয়ে ফিরে আসবার সময়, আশ্চর্য্য, চোখের সামনে লণ্ঠনটা সেখানে জ্বলতে দেখেও সেটার কথা সে কিছু ভাবতে পারলো না।

অন্ধকারে, এদিকে-ওদিকে বন্ধুরাও কেমন স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

যতোক্ষণে না অনাদি ফিরে এসে দেয়াশলাইয়ের একটা কাঠি ধরালো।

কাঠির সেই ক্ষীণোদ্ভাসিত চকিতে আলোতে এবার সেই আর্ত্তনাদটা অনাদির কণ্ঠে এসে বাসা নিয়েছে : এ কী !

এতোক্ষণে বন্ধুদের যেন হুঁস হ'লো। করবার মতো একটা কাজ পেয়ে এতোক্ষণে বাইরের ঘর থেকে লণ্ঠনটা অমৃত নিয়ে আসতে পারলো যা হোক।

লণ্ঠনের স্থির আলোতে এবার যা অনাদি দেখলো, তাতে তা'র দেহে কোথাও আর এককণা রক্ত রইলো না।

তরলা দুয়ারের কাছে মেঝের ওপর শোয়া, তা'র মাথায় কোথায় খানিকটা কেটে এলোমেলো কালো চুলের মধ্যে থেকে রক্তের একটি ধারা নেমে এসেছে।

কিন্তু সেই দৃশ্যের চেয়ে আরো যেন একটা ভয়াবহ দৃশ্য ছিলো। অনাদি কেন কে জানে, প্রথম সেই দিকেই অগ্রসর হ'লো।

কিন্তু বৃথা, ডাক্তার ডেকে আনবারো সময় নেই, খোকার শেষ হ'য়ে গেছে।

—তরলা ! অনাদি ক্ষিপ্তের মতো গর্জ্জন করে' উঠলো।

সবাই এলো তা'র এই উদ্গত শোকাকুলতাকে প্রশমিত করতে। অমৃত বললে,—ভয় নেই, জ্ঞান আছে। পুলিন ডাক্তারকে শিগগির ডেকে নিয়ে এসো, শ্রীশ।

অনাদিকে সবিস্তার সব বন্দোবস্ত করতে হ'লো, কিন্তু মূর্চ্ছা ভাঙতে-ভাঙতে প্রায় ভোর।

তা'র সেই দুর্ব্বল, বিশাল চাওয়ার দিকে চেয়ে অনাদির সমস্ত শরীর মমতায় আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো : কী করে' পড়ে' গেলে, তরলা?

তরলা চারিদিকে শূন্য চোখে তাকাতে-তাকাতে বললে,—আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো।

—ফেলে দিলো? কে ফেলে দিলো? অনাদি আঁৎকে উঠলো।

—ওর মা।

—কা'র মা? তুমি কী বলছ, তরলা?

—কী জানি ওর নাম! মনে-মনে তরলা অন্ধকার হাতড়াতে লাগলো: ভুলে গেছি, মনে পড়ছে না, হ্যাঁ, খোকা—খোকার মা।

—খোকার মা আবার কোত্থেকে এলো? সিঁথির দুই ধারে অনাদি তা'র চুলগুলি পাট করে' দিতে লাগলো : তুমিই তো ওকে কোলে নিয়ে হাঁটছিলে।

—না, আমি নয়, সত্যিকারের সেই মা, সত্যিকারের যার এই বাড়ি।

—তুমি এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো তো।

—ঘুমোবো, কিন্তু বলো, খোকার খুব বেশি চোট লাগে নি তো? তরলা তা'র হাতের দুই মুঠি হঠাৎ শক্ত করে' ধরলো: ইস, আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেই হ'লো কিনা। আমি যেন ওকে বুকে-পিঠে ক'রে মানুষ করছি না।

—তুমি মাথা ঘুরে পড়ে' গিয়েছিলে, তরলা!

—আমি যেন ওর চেয়ে খোকাকে কিছু কম ভালোবাসি! তরলার দুই চোখ জলে আবছা হ'য়ে এলো: খোকাকে আমার কাছে দাও না এনে একটুখানি।

—তুমি ভালো হ'য়ে ওঠো, তখন কোলে নেবে বৈ-কি।

—না, আমি এখুনি বেশ ভালো আছি, আমি দিব্যি ওকে কোলে নিতে পারবো। দুই চোখে অবারিত বিশ্বাস নিয়ে তরলা স্বামীর মুখের দিকে তাকালো: জানো, যতোই কেননা আমাকে ও ধাক্কা দিক, আমি কোল থেকে আমার খোকাকে কিছুতেই ছেড়ে দিই নি। বলো, আমি হেরে যাবো, আমি মা নই, আমি হেরে যাবো ওর কাছে?

—কে তোমাকে ধাক্কা দিতে আসবে, তরলা? অনাদি তা'র মাথার কাছে করুণায় নেমে এলো: কী একটা বাজে স্বপ্ন দেখছিলে, অনবরত খাটুনির জন্যে দুর্ব্বলতায় ঘুরে পড়ে' গেছ, কিম্বা ঐ টেবলটার কোণায় হয়তো ধাক্কা খেয়েছিলে—

—নয়, নয়, সত্যি তা নয়। তরলা সর্ব্বাঙ্গে কেঁপে উঠতে লাগলো : জোর করে' আমার হাত থেকে ও খোকাকে ছিনিয়ে নিতে এলো, আমি কিছুতেই তাকে ছেড়ে দিলুম না, তাই আমাকে ঠেলে ফেলে দিলো দরজার চৌকাঠের ওপর। আমার কথা তোমার বিশ্বাস হয় না? ভয়ে স্বামীর বুকের মধ্যে তরলা মুখ লুকোলো : তুমিও তাকে একদিন দেখবে দেখো। সে মরেনি, এখানেই সে কোথায় আছে।

অনাদি বিমূঢ় চোখে চারদিকে তাকাতে লাগলো—কোথায়!

হঠাৎ তরলা উঠলো আবার ঝঙ্কার দিয়ে : খোকা—কী জানি ওর নাম—ওকে রাখলে কোথায়?

—আছে ও পাশের ঘরে। বোজা গলায় অনাদি বললে।

—পাশের ঘরে! কা'র কাছে?

অনাদি আমতা-আমতা করতে লাগলো।

—কা'র কাছে ওকে রেখে এলে? সেই আন্নাকালিকে আবার ডেকে এনেছ নাকি? তরলা উঠে বসবার দুর্ব্বল একটা চেষ্টা করলো : দেখো, ওকে সাবধান করে' দিয়ো, খবরদার—আমি যে-নাম ওর রেখেছিলাম, কী জানি সেই নাম—আমার কিছু মনে পড়ছে না কেন, সেই নাম, সেই নামে ওকে ডাকতে হ'বে।

—আন্নাকালিকে আর কোথায় পাবো?

—তবে খোকা, খোকা এখন কা'র কাছে পাশের ঘরে? তরলা ডুকরে কেঁদে উঠলো : ওর মা, ওর মা'র কাছে বুঝি?

—দাঁড়াও দেখে আসি। অনাদি জোর করে' ঘরের বাইরে চলে' এলো।

দশ

সেই যে তরলা বিছানায় ভেঙে পড়লো, আর তা'র গা-ঝাড়া দিয়ে উঠবার নাম নেই। দেখা দিলো প্রবল জ্বর, দেখতে লাগলো বিভীষিকা। দিনের আলোয় যখনই মুহূর্ত্তগুলি একটু তরল হ'য়ে আসে, তরলা শূন্য চোখে চারদিকে চেয়ে কেঁদে ককিয়ে ওঠে : আমার খোকা, আমার নবকুমার।

অনাদি তা'র চারধারে আদরে ঝরে' পড়তে থাকে : তুমি ভালো হ'য়ে ওঠো, ভয় কী, খোকা আবার ফিরে আসবে, তরলা।

—ফিরে আসবে! তরলা যেন কথাটার আদ্যোপান্ত কিছু বুঝতে পারলো না : ফিরেই যদি আসবে তবে ও গেলো কেন বলো? আমি কি ওকে যথেষ্ট ভালোবাসি নি?

—যে গেছে সে যাক, তাকে যেতে দাও। কী যে প্রবোধ দেবে অনাদি হাঁপিয়ে উঠলো : পরের ছেলে, থাক ও পরে নিয়ে।

—পরের ছেলে! কিন্তু আমি কি ওর মা ছিলুম না?

বাইরের ঘুটঘুটি অন্ধকারের দিকে অনাদি নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলো।

—তুমি জানো না, আমি যতোই কেননা মা হই, 'ও আমার মা ছিলো না' এ-কথা কে যেন ওকে শিখিয়ে দিয়ে গেলো। তরলা ভীত একটা নিশ্বাস ফেললো: তাই সেদিন থেকে ওর মুখে সেই তেতো সেই বিস্বাদ একটা হাসি ভেসে উঠেছিলো, যেন সব সময়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বিষাক্ত একটা ঠাট্টা করছে! কে যেন ওকে শিখিয়ে দিয়ে গেলো।

অনাদি আর কিছু কথা বলবার না পেয়ে তার মুখের কাছে নুয়ে এসে বললে,—তুমি এখন একটু চুপ করে' শুয়ে থাকো, তরলা, ডাক্তার তাই বলে' গেছেন। চুপ করে' শুয়ে থাকতে না ভালো লাগে, অন্য কথা বলো, কেমন সুন্দর আজ মেঘ করেছে, কতোদিন এ-দিকটায় বৃষ্টি হয় নি, চাষবাসের কী দুর্দ্দিন যাচ্ছে ঘোরতরো—

কোনো কথাই তরলা কানে তুললো না, নিঃস্ব, অসহায় গলায় চীৎকার করে' উঠলো: তুমি জানো না, আমি—আমিই তাকে মেরে ফেলেছি।

—তুমি মারতে যাবে কেন? জোর করে' যদি কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যায়—

—হ্যাঁ, তাই তো, কিছুতেই তাকে আমি রাখতে পারলুম না। তরলা কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠলো : হেরে গেলুম, ভীষণ হেরে গেলুম। এ-কলঙ্ক কিছুতেই আমি সইতে পারছি না।

—মৃত্যুর সঙ্গে মানুষে কে পারবে বলো? এটা আমাদের পরাজয় নয়, এটাই আমাদের পরিচয়, তরলা।

—হার নয়? আর্ত্তনাদে তরলা যেন সর্ব্বাঙ্গে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো : আমার এতো যৌবন, এতো আকাঙ্ক্ষা, এতো ভালো-বাসা সব শুকিয়ে ম্রিয়মান হ'য়ে গেলো, তুমি তাকে হার বলবে না? নিমেষে কথাটাকে তবলা অন্য অর্থে নিয়ে গেছে : কোথাকার একটা মৃত্যু, মৃত্যুর সেই একটা ছায়া, কালো একটা স্মৃতি—তা'র কাছে আমি হেরে যাবো? আমার এই জীবন, আমার এই কামনার দীপ্তি, এই আমার অস্তিত্বের উজ্জ্বলতা—কিছুতেই আমি তা'র সঙ্গে পেরে উঠবো না?

রাতের ডাক্তার এসে দেখে গেলো। তার মামুলি, যান্ত্রিক গলায় ছাড়া, আর কিছু সে বেশি আশা দিতে পারলো না।

রাত তখন গভীর, মেঘের ভারে আকাশ যেন শূন্যের উপরে খানিকটা ধোঁয়ার মতো ঝুলছে, ঘরের কোণে বাতি জ্বলছে নিবু-নিবু, তরলা স্বপ্নে হঠাৎ দুই হাত দিয়ে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরলো : ও যদি আসে, তবে তুমি আমাকে ককখনো ছেড়ে দিয়ো না। তুমি তো আমাকে ওর চেয়ে অনেক, অনেক বেশি

ভালোবাসো। তুমি হেরে যেয়ো না, হেরে যেয়ো না ওর কাছে, আমার মতো হেরে যেয়ো না। তোমার বুকের মধ্যে আমাকে খুব জোর করে' ধরে' রেখো।

অনাদি তাকে দুই হাতের উষ্ণ নিবিড়তায় আবৃত করে' ধরলো: কে, কে আসবে, তরলা?

—আমি কি তাকে কখনো দেখেছি? তরলা হেসে উঠলো কিনা অস্পষ্ট আলোতে কিছু বোঝা গেলো না।

অনাদির কেমন ভয় করতে লাগলো। হ্যাঁ, দরজাটা বন্ধ আছে তখন থেকে, হাত বাড়িয়ে শিয়রের জানলাটা সে এবার আস্তে বন্ধ করে' দিলে। অন্ধকার আকাশটা যেন একদৃষ্টে তা'র মুখের দিকে চেয়ে আছে।

—না, না, জানলাটা বন্ধ করছ কেন, তোমার ভয় কী? তরলা শ্রান্ত, অশরীরী গলায় বললে,—যদি সে আসেই, স্পষ্ট মুখের উপর তাকে বলে' দিয়ো: 'তোমার চেয়ে একে, তরলাকে আমি বেশি ভালোবাসি। তুমি কুৎসিত একটা মৃত্যু, এ পরিপূর্ণ একটা জীবন, আগুনের মতো বহু আগুনের উৎস।' বলে' দিয়ো স্পষ্ট করে': 'তুমি একটা স্মৃতি, আর এ একটা উজ্জ্বল, উত্তপ্ত উপস্থিতি। তুমি একটা ছায়া, আর এ একটা রক্তময় রূপ!' প্রলাপের ঘোরে অনেকগুলি কথা বলে' ফেলে তরলা হাঁপাতে লাগলো: তুমি তাকে বলে' দিয়ো, তা হ'লেই সে হেঁট মুখে

চলে' যাবে। তুমি হেরো না যেন, আমার মতো তুমিও তা'র কাছে হার মেনো না। ভয় কী, জানলাটা খুলে দাও।

না, ভয় কী, জানলাটা অনাদি খুলে দিলো।

তরলা বললে,—এ কী, তুমি এখন ঘুমুতে আসবে না?

—না, অনাদি দৃপ্ত, দৃঢ় গলায় বললে,—আমি তোমার পাশে বসে' আজ জাগবো।

—হ্যাঁ, স্বামীর হাতের মধ্যে তরলা তা'র দুর্ব্বল, ক্লিষ্ট হাতখানা ঢেলে দিলো, বললে,—আজ রাতটা আমার কাছে কেমন বিশ্রী লাগছে। সারা রাত জেগে আমাকে তুমি পাহারা দাও।

—তাই বলে' তোমাকেও আর জেগে পাহারা দিতে হ'বে না। অনাদি অনুনয় করে' বললে,—তুমি ঘুমোও।

—ঘুম আসছে না যে। ভারি ভয় করছে যে আমার। তুমি আমার আরো কাছে সরে' এসো।

—ভয় কিসের? অনাদি তা'র শরীরের সমস্ত দৃঢ়তা দিয়ে উচ্চারণ করলে: আমিই তো তোমার আছি।

হ্যাঁ, অনাদিই তো তা'র আছে। যদি কেউ আসেও আজ রাত করে', তা'র প্রেতায়িত পরিশূন্যতায়, অনাদি তাকে শুধু তা'র এই সবল উপস্থিতি দিয়ে প্রতিহত করবে। কেই বা আসবে তা'র কাছে, মৃত একটা মুহূর্ত্ত, ব্যয়িত একটা দীর্ঘশ্বাস! জীবনের এই উৎসবে উড়ে'-আসা একমুঠো শ্মশানের ভস্ম! তা'র

এই বিস্তৃত বিস্মৃতির আকাশে কোথাকার কোন এক রাত্রির জাগরণ! মিথ্যা কথা।

সেবায় ও পরিশ্রমে অনাদি দৈত্যকায় হ'য়ে উঠলো।

হ্যাঁ, পৃথিবীতে সে বাঁচতে এসেছিলো, এসেছিলো ভোগ করতে। তা'র জন্যে আকাশে ছিলো প্রশ্রয়, প্রতি সূর্য্যোদয়ে ছিলো উদার অভ্যর্থনা। ক্ষণকালিক জ্বলন্ত একটা বিদ্যুতের মতো হাহাকারে বিদীর্ণ হ'য়ে দীর্ঘ দিন ধরে' সে অবিচল অন্ধকারের উপাসনা করতে আসে নি। রক্তে ছিলো তা'র পিপাসা, স্নায়ুতে ছিলো তা'র ঝঙ্কার। তা'র প্রেম ছিলো সময়ের মতো অসীম হ'য়ে। সময়—এই সময়ই ছিলো অনাদির শেষ আশ্রয়, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তা'র অবারিত এই স্রোত—যে-স্রোতে স্মৃতির সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত আবর্জ্জনা নিঃশেষে ধুয়ে যাবার কথা। কেননা স্মৃতি নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না, তা'র চাই নিষ্ঠুর স্থূলতা, তা'র চাই একটি উদ্ধত মেরুদণ্ড। অনাদি তেমন করে'ই বাঁচতে চেয়েছিলো—ভয় কী, পৃথিবীতে মানুষ তেমন করে'ই বাঁচতে এসেছে। জীবনের শোভাযাত্রায় দুর্নিবার অগ্রসরই হচ্ছে বাঁচা!

এই মাত্র শেষ দাগ ওষুধ খাইয়ে অনাদি মুহ্যমানের মতো ইজিচেয়ারে এসে আধখানা একটু শুয়েছে, নিস্পন্দ হ'য়ে আছে নিথর কালো রাত্রি, হঠাৎ কা'র ভীরু পায়ের শব্দে, শিথিল একটু সাড়ির খসখসানিতে অনাদির তন্দ্রা ভেঙে গেলো।

নেপথ্য

ঘরে বিশেষ আলো ছিলো না, অনিদ্রায় প্রখর তা'র দুই চক্ষুর দীপ্তিতে অনাদি স্পষ্ট দেখতে পেলো কে যেন কখন সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

দুই চোখের সমবেত নিষ্পলকতায় অনাদি সেই আগন্তুকের দিকে পাষাণীভূতের মতো চেয়ে রইলো।

পরনে কবেকার লাল সেই পুরোনো একটা সাড়ি, সন্ত পানের রসে ঠোঁট দু'টি পিছল হ'য়ে টুক্‌টুক্ করছে, আলতো খোঁপাটা পিঠের উপর ভেঙে পড়ে' ছড়িয়ে দিয়েছে রাশি-রাশি সুরভিত কোমলতা, সমস্ত দাঁড়াবার ভঙ্গিতে লঘু-বঙ্কিম সলজ্জ একটি মাধুর্য্য—স্পষ্ট, একেবারে স্পষ্ট চপলা। বহু যুগের স্তব্ধ, পিপাসিত প্রতীক্ষা দিয়ে যেন তৈরি। একা আসে নি, কোলে তা'র খোকা। হেঁট হ'য়ে আঁচলের তলায় শান্ত, পরিতৃপ্ত মুখে মা'র সে দুধ খাচ্ছে।

অনাদি কথা বলতে গেলো, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো না, দু'পায়ে দাঁড়াতে গেলো, কিন্তু পায়ের নিচে তা'র মাটি নেই।

চপলা তা'র দিকে একবার চেয়েও দেখলো না, যেন কতো রাত সে ঘুমুতে পারে নি, এখুনি শুতে পেলে যেন সে স্বর্গ পায় এমনি নির্ভুল আত্ম-নিমগ্নতায় আস্তে-আস্তে সে খাটের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।

মলিন, মুমূর্ষু কণ্ঠে তরলা উঠলো হঠাৎ চীৎকার করে' : ওকে

ফিরিয়ে দাও, ওকে চেঁচিয়ে চলে' যেতে বলো শিগ্‌গির। বলে' দাও যে লোক মরে' যায়, তাকে আমরা কক্‌খনো ভালোবাসি না।

অনাদি প্রাণপণে চীৎকার করে' উঠতে চাইলো, কিন্তু তা'র কণ্ঠস্বর পাথরের মতো কঠিন।

—উঃ, শিগ্‌গির এসো, অন্ধকারে তরলা আবার একটা আর্তনাদ ছুঁড়ে মারলো: গলার উপর আমার কে হাত চেপে ধরেছে। ঠেলে সরিয়ে দাও সেই হাত। আমার নিশ্বাস যে বন্ধ হ'য়ে এলো।

অনাদি এতোক্ষণে যেন বিমূঢ় বিহ্বলতায় উঠে দাঁড়াতে পারলো। শুনলো কে যেন তাকে ডাকছে, তা'র কাছেই, এই ঘরের মধ্যে।

তা'র মনে পড়ে' গেলো, অকস্মাৎ মনে পড়ে' গেলো, ঘরের মধ্যে বিছানায় তরলা শুয়ে আছে।

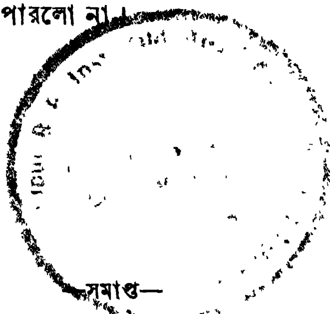
অনাদি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তরলাকে নিবিড় করে' কাছে টেনে আনলো।

আশ্চর্য্য, অনাদি রাশীকৃত সেই অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পেলো কে যেন তরলার কণ্ঠ থেকে তা'র হাতের গ্রন্থিটা আস্তে-আস্তে খুলে নিচ্ছে। দুই হাতে তরলাকে আর সম্পূর্ণ করে' ধরে' রাখা যাচ্ছে না।

চেঁচিয়ে উঠবার আগে অনাদি লণ্ঠনের শিখাটা জোর করে' বাড়িয়ে দিলো।

স্পষ্ট সে এবার দেখতে পেলো তরলাকে সরিয়ে দিয়ে বিছানায় চপলা আছে শুয়ে।

সে আর চেঁচাতে পারলো না।



—সমাপ্ত—